ওঁ

ব্রহ্মচর্য্যম্



ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমম্

স্বামী বেদানন্দ

ওঁ

ব্রহ্মচর্য্যম্

* * *

যাঁর তপঃসিদ্ধ দিব্য জীবনে বৈদিক ঋষির মনোময়
ভারতের অখণ্ড আদর্শ মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে,
ব্রহ্মচর্য্যের মহাঋক্ যাঁর অভয়কণ্ঠে
উদ্গীত হয়ে ভবিষ্যৎ ভারতের
উদ্বোধন করেছে,
তাঁরই অক্ষয় আশীর্ব্বাদ স্বরূপ "ব্রহ্মচর্য্যম্"
তরুণ ভারতের শ্রদ্ধাবনত শিরোপরি
বর্ষিত হউক!
ওঁ তৎ সৎ হরি ওঁ॥

ওঁ

নিবেদন

আজ ভারতের জাতীয় জীবনের গোপন অন্তরালে অকাল-বীর্য্যক্ষয় ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় তরতর বেগে বহিয়া যাইতেছে। সে তীব্র স্রোতোবেগে ভারতের সুখ-সম্পদ, আশাভরসা, তেজোবীর্য্য, বীরত্ব, মনুষ্যত্ব সমস্ত ধুইয়া মুছিয়া নিঃশেষ হইতেছে। কেহ দেখিয়াও দেখে না, শুনিয়াও অজ্ঞের ভান করে, বুঝিয়াও উপেক্ষা করে। দেশের দুঃখে আমরা নয়নজলে ঝরিয়া মরি; কাগজ-পত্রে, সভা-সমিতিতে, আলাপে বক্তৃতায় আগ্নেয় গিরির 'লাভা' প্রবাহ ছুটাইয়া দেশপ্রেমের বন্যা বহাইয়া দিই। কিন্তু আমারই ঘরের কোণে আমারই কচি কচি সন্তানগুলি যে কুসঙ্গে, কুকার্য্যে, কদালাপে, কুচিন্তায় না জানিয়া না বুঝিয়া—অহরহঃ ডুবিয়া, মজিয়া, স্বাস্থ্য-শক্তি-মেধাহীন হইয়া ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইতেছে—তা কি আমরা দেখি? না, দেখিয়াও বুঝি? না বুঝিয়াও তার প্রতিকারের জন্য মাথা ঘামাই?

সুকুমারমতি বালকগণ প্রলোভনের কুহকে না জানিয়া, না বুঝিয়া আকৃষ্ট হয়; বুঝিয়া প্রতিকারের চেষ্টা করে যখন, তখন পথ পায় না,—সাহায্য পায় না, সহানুভূতি পায় না, উৎসাহ পায় না, উপদেশ পায় না। তাদের প্রাণের ব্যথা বুঝিয়া দরদ করে—এমন লোক পায় না। অভিভাবকের নিকট মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না, শিক্ষকের নিকটেও প্রতিকারের আশা থাকে না;—হায়! ভারতের আশা-ভরসার মুকুলগুলি যে এমনি ক'রে 'বুকচাপা' তুষানলে জ্বলে পুড়ে অঙ্গার হ'য়ে জাতির শ্মশান-চিতায় ভস্মমুষ্টিতে পরিণত হ'তে চলেছে। হা! উন্মার্গগামী ভারত, তুমি কি বাঁচিয়া আছ? অথবা, বিজাতীয় বিষপানে মৃত্যুর কবলে ঢলিয়া পড়িয়াছ?

তরুণ ভারতের বুকের ব্যথা, ব্যাকুল কণ্ঠের কাতর আর্ত্তনাদ আজ একটি সমবেদনাপর মহাপ্রাণকে কাঁদিয়ে তুলেছে। তাই সেই মহাপুরুষ আপনার

আজীবন কঠোর সাধনা ও অলৌকিক তপশ্চর্য্যার অমর রীর্য্যে তরুণ ভারতের প্রাণশক্তির উদ্বোধন করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। দেশের বালক ও যুবকগণের কাতর ও বেদনাক্লিষ্ট মুখমণ্ডলে, আনন্দ ও বীর্য্যের হাস্যজ্যোতিঃ ফুটিয়ে তুলতে তিনি ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত "মাভৈঃ" বাণী শুনিয়ে ফিরছেন। লক্ষ লক্ষ যুবক ও বালক তাঁর চরণপ্রান্তেব্রহ্মচর্য্যসাধন প্রাপ্ত হয়ে কৃতার্থ হচ্ছে। তরুণ ভারতে এমন দরদী, মরমী, ব্যথার ব্যথী,—দুঃখে শান্তি, শোকে সান্ত্বনা, ভয়ে আশার সঞ্চার করতে আজ আর কেউ নেই।

তাঁরই অক্ষয় আশীর্ব্বাদস্বরূপ এই "ব্রহ্মচর্য্যম্" দেশের বালকগণের নিকটে উপস্থিত করা হইতেছে। এই পুস্তিকা পাঠে সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য পালনে তাদের আকাঙ্ক্ষা ও নিষ্ঠা জাগুক, আচার্য্যদেবের পবিত্র চরণে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর নিকট সাধন লাভ করুক,—স্বাস্থ্যে, চরিত্রে, বলবীর্য্যে, মেধা-প্রতিভায় তারা বংশের মুখ, সমাজের বুক, জাতির ললাট উজ্জ্বল ও গৌরবময় করে তুলুক।

যাদের উদ্ধারের জন্য এই সঙ্ঘের প্রাণপুরুষ যুগাচার্য্য আপনার আজীবন তপশ্চর্য্যার ফল উৎসর্গ করেছেন, দেহের শোণিত বিন্দু বিন্দু ব্যয় করেছেন—ভারতের তরুণমতি বালক ও যুবকগণ! তোমাদের এই অহৈতুক দরদীর ভাবনা কর, চিন্তা কর, ধ্যান কর, প্রার্থনা কর, শরণ গ্রহণ কর, ভালবাস, সেবা কর,—তাঁর কৃপাস্পর্শে শক্তিমান্ হও! ভারত আবার সোনার ভারতে পরিণত হউক!

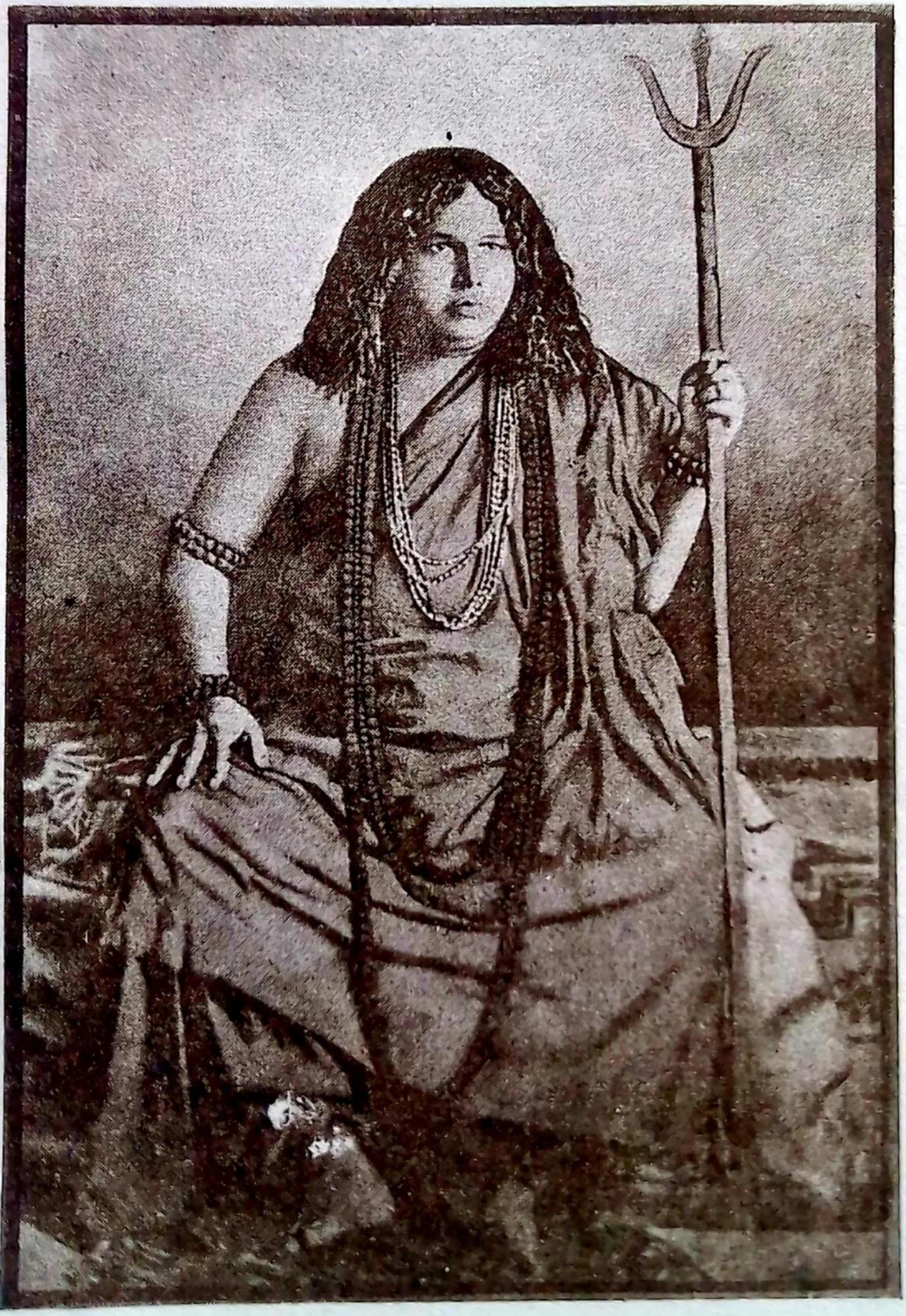
এই পুস্তকে সামান্যতঃ কয়েকটি উপদেশ লিখিত হইল। যাহাদের আত্মজীবন গঠনে আকাঙ্ক্ষা আছে, তাহাদিগকে ব্যক্তিগতভাবে বর্ত্তমান সঙ্ঘগুরুর নিকট শক্তি ও ব্রহ্মচর্য্যসাধন গ্রহণ করিতে হইবে। এই গ্রন্থে লিখিত নিয়মাদি প্রাথমিক সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য সাধনে সহায়তা করিবে। কিন্তু শক্তি লাভ করিতে হইলে শক্তিমানের যত নিকটে যাওয়া যায় ততই সুবিধা। বর্ত্তমান সঙ্ঘ-সভাপতি অথবা সঙ্ঘ-সম্পাদকের নিকট চিঠিপত্র দিয়েও সাময়িক উপদেশাদি লওয়া যাইতে পারে।

বাংলা ও বাংলার বাইরে নানাস্থানে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠিত আশ্রম

ও মঠাদি আছে। স্কুল-কলেজের ছাত্রগণ যাহারা ব্রহ্মচর্য্য পালনে বিশেষ উৎসুক তাহারা ছুটির সময়ে, মধ্যে মধ্যে চিঠিপত্রাদি দ্বারা ঠিকানা জানিয়া বর্ত্তমান সঙ্ঘ-সভাপতির সহিত দেখা-সাক্ষাৎ ও ইচ্ছানুযায়ী কিছুদিন যে কোন আশ্রমে বাস করিয়া পবিত্রভাবে জীবন-যাপন করিতে পারে। ছুটির সময়ে অনেকেরেই এরূপ সুযোগ ঘটিতে পারে।

সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠিত কলকাতা আশ্রমে বিশেষতঃ ঁমাঘী পূর্ণিমা, ঁশিবরাত্রি, ঁকালীপূজা, ঁজন্মাষ্টমী, ঁগুরুপূর্ণিমা প্রভৃতি সময়ে, পুরী আশ্রমে শ্রীশ্রীরথযাত্রায়, গয়া আশ্রমে মহালয়ার সময়ে, কাশী আশ্রমে ঁদুর্গোৎসবের সময়ে উৎসবাদি সম্পন্ন হয়। যাহারা সাক্ষাৎ ও উপদেশপ্রার্থী তাহারা উক্ত সময়ে সুযোগ মত যে কোন উৎসবোপলক্ষ্যে গিয়া বর্ত্তমান সঙ্ঘ-সভাপতির সহিত দেখা করিতে পারেন। অথবা, সুযোগ মত চিঠিপত্রে সংবাদ লইয়া যে কোন স্থানে তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারেন। ওম্

—ঃঃ—



যুগাচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ
প্রতিষ্ঠাতা—ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

ওঁ

ব্রহ্মচর্য্যম্

আশীর্ব্বাদ

আজ জাতীয় অভ্যুদয়ের অরুণ প্রভাতে হে ভারতের নব জাগ্রত তরুণ দল! তোমাদের উৎসাহচঞ্চল শিরে আজ বিশ্ববিধাতার বিজয় আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হয়েছে! তোমাদের বিজয়-অভিযানের সৈনাপত্য গ্রহণ করতে আজ বিধাতা স্বয়ং উপস্থিত! তোমাদের স্বাস্থ্যহীন পাণ্ডুর মুখে রক্তিম হাসির অফুরন্ত উৎস ফুটবার জন্য, তোমাদের সংযমশিথিল স্নায়ুমণ্ডলীতে ব্রহ্মচর্য্য সঞ্চার করবার জন্য; তোমাদের তন্দ্রা-অবশ ধমনীতে অসাড় শোণিতস্রোতকে পুনরায় বজ্রবেগে ছুটাবার জন্য, তোমাদের আলস্যশ্লথ করমুষ্টিতে বজ্রের দৃঢ়তা সঞ্চার করতে, তোমাদের সংশয়মৃদু চরণে বৈদ্যুতিক গতি উৎপাদন করতে, তোমাদের শিরায় শিরায়, প্রতি রক্তবিন্দুতে, প্রতি রোমকূপে প্রাণশক্তির তাণ্ডব উদ্দীপনা আনয়নের জন্য আজ সর্ব্বনিয়ন্তার অক্ষয় করুণা ও স্নেহাশীর্ব্বাদ এক তপঃসিদ্ধ মহাপুরুষের দেহে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে! সেই আশ্বাস ও আশীর্ব্বাদের বাণী আজ তোমাদের শুনাব।

বহু শতাব্দী-ব্যাপী জাতীয় পাপের ফলে আজ ভারতের ভবিষ্যতের আশা-ভরসা—বালক ও যুবকগণ বড় দুর্দ্দাশাগ্রস্ত—হীনস্বাস্থ্য, ক্ষীণ-দেহ, দুর্ব্বলমস্তিষ্ক, নিরুৎসাহপ্রাণ। তাদের শীর্ণ মুখের দিকে তো কেহ ফিরেও চায় না। তাদের প্রাণের ব্যথা-বেদনা কেউ তো জানে না, বুঝে না,—শুনেও না। তাদের দুঃখ বোঝে, দরদ করে, সাহায্যের জন্য অভয়হস্ত প্রসারণ করে,—এমন তো কাউকে দেখিনে! এ বিষয়ে শিক্ষকগণ দায়িত্বহীন; অভিভাবকগণ উদাসীন; আত্মীয়-স্বজনগণ নরকের সহযাত্রী; আর বন্ধু-বান্ধবগণ শয়তানের অনুচররূপে উহাদিগকে প্রলোভনের মোহিনী মায়ায় ভুলিয়ে অধঃপতনের রৌরবে, মৃত্যুর মুখে এগিয়ে

নিয়ে যাচ্ছে। তাদের কথা কেউ বা শোনে সেও ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করে, কেউ বা উপেক্ষার বিষমাখা হাসিতে তাদের মর্ম্মস্থল জ্বালিয়ে দেয়, কেউ তিরস্কারমিশ্র তিক্ত উপদেশে জীবনের পথ বিষাক্ত করে তোলে।

তরুণহৃদয়ের কাতর আর্ত্তনাদে তাই বিধাতারও আসন বিচলিত হয়েছে; তাই তরুণ ভারতের ত্রাতা, পাতা, পথনির্দ্দেষ্টা আপনার তপোঘন দেহমনে সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যের পরিপূর্ণ আদর্শ ফুটিয়ে কণ্ঠে অমৃতময়ী অভয়বাণী এবং হস্তে মহাশক্তির অমোঘ স্পর্শ নিয়ে আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী আবির্ভূত হয়েছেন। সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যের ভিত্তিতে বৈদিক আদর্শে দেশ ও জাতিকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আশৈশব অটুট ব্রহ্মচর্য্য সাধনসিদ্ধ শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের ভিতরে এক মহাশক্তির আবির্ভাব। নগরে নগরে, জনপদে জনপদে পল্লীতে পল্লীতে, গৃহে গৃহে, কত শত সহস্র নরনারী—আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা—তাঁর শক্তিপূত আশ্বাসবাণী লাভ ক'রে তাঁর দিব্যস্পর্শে শক্তিমান্ হয়ে কাল যাপন করছে। আর আজ লক্ষ লক্ষ বালক ও যুবক, শত সহস্র স্কুল-কলেজের ছাত্র দলে দলে তাঁর চরণতলে শক্তিপ্রার্থী হয়ে তাঁর স্পর্শে ও নির্দ্দেশে ব্রহ্মচর্য্যসাধন দ্বারা আত্মজীবন গঠনপূর্ব্বক—দেহে স্বাস্থ্য, প্রাণে বল, হৃদয়ে উৎসাহ লাভ ক'রে ভবিষ্যৎ ভারতের অপূর্ব্ব অভ্যুদয়ের ভিত্তি পত্তন করছে।

ভারতের মুক্তিমন্ত্রের বীজ—ব্রহ্মচর্য্যম্! সংযম ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ—সে সঞ্জীবন মন্ত্র। আর সে মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি—শ্রীমৎ আচার্য্যদেব।

এস আজ ভারতের তরুণদল! দলে দলে, অযুতে অযুতে, কোটিতে কোটিতে। এস! আজ সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যের সাধনায় দীক্ষিত হও। সে শক্তিপূত মহামন্ত্র তোমাদের দেহ-মন-প্রাণে, তোমাদের সমগ্র রক্ত-মাংস-মেদে, তোমাদের অস্থি-মজ্জা-শুক্রে—তোমাদের সমগ্র জীবনে এক মহাশক্তির তাণ্ডব উদ্দীপনা সঞ্চার করবে, ব্রহ্মবীর্য্য ও ব্রহ্মতেজঃ তোমাদের ধমনীতে অটুট ছন্দে নৃত্য কর্‌বে। তোমাদের ব্রহ্মচর্য্যদৃঢ়, সংযমপূত শরীর-মন এক অপূর্ব্ব আনন্দে ভরে উঠবে! তোমাদের সমাজ ও সংসার শান্তি ও শৃঙ্খলায় হাস্য কর্‌বে। তোমাদের গৌরব-হাস্যে ভারতের মলিন মুখ আশা ও আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

ঐ শোন তাঁর বজ্রগম্ভীর

অভয় আশিস্‌বাণী

"ভারত ভুলিও না—তুমি ঋষির বংশধর; তোমার ধর্ম্ম ও সমাজ, শিক্ষা ও সভ্যতা ঋষির হস্তে গঠিত, ঋষির সনাতন অনুশাসনে অনুশাসিত, পরিচালিত। তোমার জাতীয় জীবনের প্রত্যেকটি কর্ত্তব্য ঋষিনির্দ্দিষ্ট! ত্যাগ-সংযম-সত্য-ব্রহ্মচর্য্যই তোমার সনাতন আদর্শ, তোমার জাতীয় জীবনের মূলমন্ত্র। ঐ আদর্শকে জীবনপণে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাক; পড়িয়া গেলেও তোমার বিনাশ নাই; পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী! ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কর। সমাজ ও জাতির জীবনে ব্রহ্মচর্য্যের অমোঘ বীর্য্য ও অক্ষয় ওজঃ বিদ্যুৎ-গতিতে সঞ্চরণ করিতে দাও।—ভারত আবার সোনার ভারতে পরিণত হইবে।"

ব্রহ্মচর্য্য কি?

ব্রহ্মচর্য্যের উচ্চতর অর্থ—ব্রহ্মে বিচরণ বা ভগবানে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ; মানব সাধনার চরম সোপানে উঠিয়া এই অবস্থা লাভ করে।

ব্রহ্মচর্য্যের সাধারণ অর্থ—বীর্য্যধারণ। "বীর্য্যধারণং ব্রহ্মচর্য্যম্"।

বীর্য্য কি?

মানবের শরীর সপ্ত ধাতুতে নির্ম্মিত, গঠিত; রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র—এই সপ্ত ধাতু। এই সপ্ত ধাতুর মধ্যে শুক্রই সকল ধাতুর সার; সুতরাং সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই শুক্রকেই বীর্য্য কহে। কায়মনোবাক্যে এই বীর্য্যকে বিচলিত হইতে না দেওয়া; পরন্তু সংযম ও তপস্যার দ্বারা এই বীর্য্যকে শরীরমধ্যে সুদৃঢ় ভাবে রক্ষা করাই—ব্রহ্মচর্য্যের উদ্দেশ্য।

আমরা যাহা আহার করি—পাঁচ দিনে তাহা পরিপাক হইয়া রসে পরিণত হয়; ঐ রস পাঁচ দিনে পরিপাক হইয়া রক্তে, ঐ রক্ত পাঁচ দিনে মাংসে, মাংস পাঁচ দিনে মেদে, মেদ পাঁচ দিনে অস্থিতে, অস্থি পাঁচ দিনে মজ্জায়, মজ্জা পাঁচ দিনে শুক্রে পরিণত হয়। সুতরাং, আমাদের ভুক্ত দ্রব্য ক্রমান্বয়ে পরিপাক হইয়া বীর্য্যে পরিণত হইতে এক মাসের অধিক অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ দিন লাগে। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি পাঁচ সপ্তাহ মধ্যে বীর্য্য ক্ষয় করে না, তাহার অর্দ্ধসের পরিমিত রক্তে এক বিন্দু বিশুদ্ধ বীর্য্য উৎপন্ন হইতে পরে। বীর্য্য কী পদার্থ—একবার অনুভব কর।

বীর্য্যের শক্তি

সুতরাং, সহজেই বুঝা যায়—বীর্য্য কত মূল্যবান্, কত শক্তিমান্ বস্তু; একবিন্দু বীর্য্য রাশি রাশি অন্নাদি ভোজনে উৎপন্ন হয়। এই বীর্য্যই লোকের জীবনী শক্তি, প্রাণের অবলম্বন। শক্তিসামর্থ্য, উদ্যম-উৎসাহ, মেধা-প্রতিভা—সমস্ত কিছুরই ভিত্তি ও উপাদান। তোমরা বিদ্যুতের শক্তি দেখিয়াছ, বজ্রের শক্তির কথা পড়িয়াছ, শুনিয়াছ—কতবিধ বৈজ্ঞানিক শক্তিনিচয়ের বিষয় নিত্য শুনিতেছ; কিন্তু, বীর্য্যের অপরিমেয় শক্তির তুলনায় তা' কিছুই নয়! স্বয়ং মহাদেব বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি ধৃতবীর্য্য, উর্দ্ধরেতাঃ, সে মানুষ নয়, সে দেবতা"*; "বিন্দু সাধনায় যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, ধরাতলে তার অসাধ্য আর কিছুই নাই।"

বীর্য্যের প্রতি বিন্দুতে কোটি বজ্রের শক্তি নিহিত; ধৃতবীর্য্য ব্যক্তির নিকট দৈবশক্তিও পরাস্ত হয়, মানুষের শক্তির কা কথা।

চতুর্দ্দশ বৎসর এই বীর্য্য ধারণের ফলে রামানুজ লক্ষ্মণ ইন্দ্রেরও অজেয় মেঘনাদকে বধ করেছিলেন। ক্ষুধা ও নিদ্রাকে সম্পূর্ণ জয় করেছিলেন। আজীবন এই বীর্য্য ধারণের ফলে কুরুপিতামহ ভীষ্মের দেহ-মন-প্রাণে এমন শক্তি ও তেজঃ প্রস্ফুটিত হয়েছিল যে, সে শক্তির নিকট একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়নিধনকারী পরশুরামও পরাজিত হয়েছিলেন, মৃত্যুও তাঁর ইচ্ছাধীন হয়েছিল। এই ব্রহ্মচর্য্য পালনের ফলে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন দেব-দানব-যক্ষ-রক্ষ-গন্ধর্ব্বকে পর্য্যন্ত—

*ন তপস্তপ ইত্যাহুর্ব্রহ্মচর্য্যমং তপোত্তমম্।
উর্দ্ধরেতা ভবেৎ যস্তু স দেবো ন তু মানুষঃ।। জ্ঞাঃ তঃ

মানুষ তো তুচ্ছ কথা—অভিভূত করে ত্রিভুবনের বিস্ময় উৎপাদন করেছিলেন।

যত্নপূর্ব্বক বীর্য্য রক্ষা করিলে সেই বীর্য্য হইতে অষ্টম ধাতু ওজঃ বা ব্রহ্মতেজঃ উৎপন্ন হয়। এই—ওজোধাতু যাকে ইংরাজীতে বলে Human magnetism—মস্তিষ্কে অবস্থান পূর্ব্বক মানবকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করে। যাহার মস্তিষ্কে এই ওজোধাতু যত অধিক সঞ্চিত হইয়াছে তিনি জগতে মানব সমাজের উপর তত অধিক আধিপত্য লাভ করেন; তাঁর সংস্পর্শে আসিলে মানবের প্রাণমন আপনা হইতেই তাঁর পায় অবনত, বশীভূত হইয়া পড়ে। তাঁর সংস্পর্শে আসিলে পশুও মানুষ হয়, নরকের কীটও স্বর্গের দেবতার ভাবে পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

তোমরা শুনিয়াছ মুনিঋষিদের নিকট অরণ্যের সিংহ-ব্যাঘ্রও পোষা বিড়ালের মত বাস করিত, হিংসা ভুলিয়া যাইত। কেন জান কি? এই বীর্য্যধারণরূপ ব্রহ্মচর্য্যসাধন দ্বারা ঋষিদের শরীরে ব্রহ্মতেজঃ সঞ্চিত থাক্‌তো। তাই তাঁরা ত্রিলোকবিজয়ী ছিলেন; তাঁরা নখদর্পণে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ করতেন।

যার শরীরে বীর্য্য অবিচলিত, সুরক্ষিত, ঐ বীর্য্য তার মাংসপেশীকে লৌহের ন্যায় শক্ত করে, তার দেহের স্নায়ুমণ্ডলীকে ইস্পাতের ন্যায় সুকঠিন করে; ঐ বীর্য্য মস্তকে সঞ্চারিত হয়ে মস্তিষ্কের অতি সূক্ষ্ম স্নায়ু-অংশে মন তৈরি হয়। সুতরাং, বীর্য্যধারণে মানসিক শক্তিও অনন্ত দিকে বর্ধিত হয় ও প্রসারিত হ'তে থাকে।

বীর্য্য আনন্দের নিদান। বীর্য্যই ঘনীভূত আনন্দ। সুতরাং, যে বালক প্রাণপণ চেষ্টায় বীর্য্য রক্ষা করে, তার প্রাণমন নিত্য তৃপ্তি ও আনন্দ, শান্তি ও সুখে ভরে উঠ্‌তে থাকে। তার হৃদয় অফুরন্ত আশা, অদম্য উৎসাহ, অসীম অধ্যবসায়-শীলতায় শতদলের ন্যায় শতমুখে বিকসিত হয়ে উঠ্‌তে থাকে।

বীর্য্য ধারণে স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে; শরীর নীরোগ ও শীতাতপসহিষ্ণু হয়; শরীরে লাবণ্য, মুখমণ্ডলে কমনীয়তা, কণ্ঠস্বরে মাধুর্য্য বিকসিত হয়। ধৃতবীর্য্য ব্যক্তির বাক্য সুচিন্তিত, কার্য্য সুশৃঙ্খল, আচরণ শিষ্ট ও প্রীতিপ্রদ, গমন স্বচ্ছন্দ। অন্তঃকরণ নির্ভীক, ধৃতবীর্য্য ব্যক্তি—অনলস, অকপট, চরিত্রবান্, সত্যপরায়ণ, মিতভাষী, মিতাচারী, লোকহিতকারী। ধৃতবীর্য্য ব্যক্তির দৃষ্টি মধুময়, হাস্য মধুময়, বাক্য মধুময়। বীর্য্যই অমৃত। অমৃত পানে দেবগণ অমর হইয়াছিলেন, আর এই বীর্য্যধারণে মানব জন্ম-মৃত্যু-বন্ধন অতিক্রম করে সত্য বস্তুকে উপলব্ধি পূর্ব্বক অমৃতত্বের অধিকারী হয়।

বীর্য্যক্ষয়ের অপকারিতা

বীর্য্যক্ষয়ের অপকারিতা অশেষ, অবর্ণনীয়। বীর্য্যক্ষয়ের দ্বারা মানবের স্বাস্থ্য-সামর্থ্য, উদ্যম-অধ্যবসায়, ধৈর্য্য-স্থৈর্য্য, মেধা-প্রতিভা, ভক্তি-শ্রদ্ধা—সমস্ত তৈলশূন্য প্রদীপের ন্যায়, জলশূন্য জলাশয়ের মৎস্যের ন্যায়, বালুকার উপর নির্ম্মিত হর্ম্ম্যের ন্যায় নিভিয়া, মরিয়া, ধ্বসিয়া যায়। তাই মহাদেব স্বয়ং বীর্য্যক্ষয় ও আত্মহত্যাকে তুলনা করিয়া বলিয়াছে—"মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ।" Chastity is life, sensuality is death. বীর্য্যক্ষয় মৃত্যু অপেক্ষাও বিভীষণ। আত্মহত্যার দ্বারা মানুষ একদণ্ডেই সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পায়; আর বীর্য্যক্ষয়ের দ্বারা অহরহঃ আত্মহত্যার ফলে মানুষ দিনে দিনে, তিলে তিলে, শারীরিক যন্ত্রণা, রোগ-শোক, পীড়া ও মানসিক অবসাদ, অশান্তি ও নৈরাশ্যের কবলে পড়িয়া মরণাধিক যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে মৃত্যুকামনায় সুদীর্ঘ জীবন্ অতিবাহিত করিতে থাকে। আজ বাংলা তথা ভারতের কত নিঃসহায় বালক ও যুবক এমন করিয়া আত্মহত্যার কবলে পড়িয়া দগ্ধীভূত হইয়া পরিত্রাহি চিৎকার করিতেছে। তাদের সে মুক আর্ত্তনাদ কাহারও পাষাণপ্রাণে বেদনার তরঙ্গ জাগাইতে পারিতেছে না।—একথা ভাবিলেও আতঙ্কে দেহ কণ্ঠকিত হয়, চোখ ফাটিয়া অশ্রু নির্গত হয়।

বীর্য্যক্ষয়ে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, নানাবিধ আধিব্যাধি আসিয়া জীবনকে ঘিরিয়া ধরে। বীর্য্যক্ষয়ে শরীর কৃশ লাবণ্যহীন হয়, চক্ষু কোটরগত ও দীপ্তিহীন হয়, কণ্ঠস্বর তীব্র ও কর্কশ হয়। বীর্য্যক্ষয়কারীর স্নায়ুমণ্ডলী উদ্‌ভ্রান্ত। বীর্য্যক্ষয়কারীর কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, অম্ল, ক্রমে বহুমূত্র, হাঁপকাশি, ক্ষয়কাশ ইত্যাদি ক্রমকঠিন ব্যাধিসমূহ উৎপন্ন হইয়া জীবনকে শ্মশানের ন্যায় ভীষণ ও হাহাকারপূর্ণ করিয়া তোলে।

আজকাল যে সমস্ত রোগ-ব্যাধিতে বাংলার তথা ভারতের নরনারী নিত্যনিয়ত লক্ষে লক্ষে মৃত্যুর মুখে ঢলিয়া পড়িতেছে, জনে জনে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, ইহার শতকরা নিরানব্বইটি বীর্য্যক্ষয় হইতে উৎপন্ন। ভারতের সুসংযতজীবন বিধবাদের মধ্যে কয় জন রুগ্না? তাদের কয় জন অকালবার্ধক্য ও অকাল মৃত্যুর দ্বারা আক্রান্ত? সংযত জীবনের প্রমাণ প্রতি গৃহে গৃহে থাকিতেও আমরা সংযমের প্রয়োজনীয়তা ভাবি না, চিনি না, দেখি না, বুঝি না।

এস ভারতের ব্রহ্মচর্য্যকামী যুবক ও বালকগণ! যারা বীর্য্যক্ষয়রূপ আত্মহত্যার কবল হইতে অব্যাহতি পাইতে চাও, যারা অশেষ রোগশোক-যন্ত্রণার পীড়ন হইতে মুক্তি চাও, যারা জীবনকে স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য, শক্তি-সামর্থ্য, তেজোবীর্য্য, উৎসাহ-উদ্যম, স্মৃতি-মেধা দ্বারা সমলঙ্কৃত করিয়া মনুষ্যত্ব লাভে উদ্যোগী, যারা বাল্যে ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে চাও, বিবাহিত যুবক যারা ধৃতবীর্য্য হইয়া আদর্শ গৃহস্থ হইতে চেষ্টিত,—এস সকলে সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের চরণে ব্রহ্মচর্য্য সাধন লাভ কর, ব্রহ্মচর্য্য পালন কর। তোমাদের সংসার ও সমাজ, দেশ ও জাতি কল্যাণের অক্ষয় আশিসে অভিসিঞ্চিত হউক!

বীর্য্যক্ষয় হয় কীরূপে?

বীর্য্য যেমন সর্ব্বধাতুর সার, তেমনি বীর্য্যই আবার সকল ধাতুর আশ্রয়। বীর্য্যক্ষয়ে সমস্ত ধাতুই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সেইজন্য আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"বীর্য্যক্ষয়ই প্রায় যাবতীয় ব্যাধির মূল নিদান।" বীর্য্য সমস্ত ধাতুর সহিত মিলিত হইয়া সমগ্র শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। কোন কারণে স্নায়ুমণ্ডলী উত্তেজিত হইলে ঐ বীর্য্যবিন্দু রক্তাদি ধাতুসমূহ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে। তজ্জন্য ব্রহ্মচর্য্যকামীর বীর্য্য ধারণের জন্য সর্ব্বদা শরীর ও মনকে যাবতীয় স্নায়বিক উত্তেজনা হইতে সুরক্ষিত, স্নিগ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিতে হয়। বহুবিধ জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত, শারীরিক ও মানসিক কারণে মানবদেহের উত্তেজনা, চঞ্চলতা উৎপন্ন হইয়া বীর্য্যক্ষয় হইয়া থাকে। ব্রহ্মচর্য্যকামীর অবগতির জন্য নিম্নে কতকগুলি কারণ দেওয়া হইল। ঐগুলি জানা থাকিলে এবং উহার প্রতিকারে যত্নবান্ হইলে বীর্য্যধারণের প্রচেষ্টা সহজ হইবে।

বীর্য্যক্ষয়ের শারীরিক কারণ ঃ—

(১) অপরিমিত আহার; অসময়ে আহার, উত্তেজক দ্রব্য আহার, বাসী পচা দ্রব্য আহার, ঘৃণাপূর্ব্বক আহার।

(২) অনিদ্রা, অতিনিদ্রা, দিবানিদ্রা, রাত্রি জাগরণ, অসময়ে নিদ্রা। বিশেষতঃ রাত্রির শেষ প্রহরে নিদ্রা। কাহারও সহিত একই শয্যায় শয়ন।

(৩) কোনও শারীরিক পরিশ্রম না করা, অতিরিক্ত পরিশ্রম বা ব্যায়াম

করা, ক্ষুধাসত্ত্বেও ব্যায়াম করা, মলমূত্রাদির বেগ ধারণ করিয়া ব্যায়াম করা।

(৪) মাদক দ্রব্য ব্যবহার করা, যথা—পান, সুপারী, চুণ, খদির, জর্দ্দা, তাম্বুলবিহার, চা, চুরুট, কফি, তামাক, নস্য ইত্যাদি।

(৫) বেশভূষা চালচলনের বিলাসিতা বা বাবুগিরি।

(৬) অঙ্গস্পর্শে—অযথা কাহারও (বিশেষভাবে বালক-বালিকা ও স্ত্রীলোকের) শরীর বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি স্পর্শ করা; কাহারও সহিত গলাগলি হইয়া বেড়ান, কাহারও সহিত জড়াজড়ি করা ইত্যাদি।

(৭) বিনা প্রয়োজনে এবং উদ্দেশ্য ও চিন্তাবিহীন হইয়া যেখানে সেখানে বেড়াইয়া বেড়ান।

(৮) কাহারও দিকে চাহিয়া বা কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া মুখভঙ্গী বা ইসারা, ইঙ্গিত করা।

(৯) বিনা প্রয়োজনে কাহারও মুখের দিকে তাকান; বিশেষতঃ বালক, বালিকা ও স্ত্রীলোকের। (সর্ব্বদা নিজের পায়ের দিকে বা সম্মুখস্থ জমির উপর দৃষ্টি রাখিতে চেষ্টা করা উচিত।)

(১০) কৌপীন ব্যবহার না করা।

(১১) কুদৃশ্য কুকার্য্য অর্থাৎ যে সমস্ত বিষয় বা বস্তু বা ব্যক্তি বা যে কার্য্যাবলী বা চিত্রাদি দর্শন করিলে মনে কুভাবের উদয় ও ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা হওয়া সম্ভব।

বীর্য্যক্ষয়ের মানসিক ও বাহ্যিক কারণ ঃ—

(১) **কুসঙ্গ**—মিথ্যাবাদী, চোর, বদ্‌মাইস, গুণ্ডা, মাতাল, বিলাসী, কুমন্ত্রণাদানকারী, বহুভাষী, নাস্তিক, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, কদালোচনাপরায়ণ ব্যক্তির সহিত মেলামেশা বা আলাপাদি করা।

(২) **কুচিন্তা**—বালক, বালিকা বা স্ত্রীলোকের চিন্তা; কুসঙ্গী বা কুকার্য্যের চিন্তা বা সঙ্কল্প, কুভাব বা কুবিষয়ের চিন্তা, অপ্রয়োজনীয় চিন্তা।

(৩) **কদালাপ**—বালক, বালিকা বা স্ত্রীলোক সম্বন্ধে আলোচনা, গুরুজন বা সম্মানিত ব্যক্তি সম্বন্ধে নিন্দা সমালোচনা, কুবিষয় বা কুকার্য্যাদির আলোচনা পরনিন্দা, পরচর্চ্চা। ভগবদ্বিরোধী বিষয়ে আলোচনা; বৃথা আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক করা। বহু কথা বলা। হাসি, ঠাট্টা, তামাসা, গালাগালি।

(৪) **কুগ্রন্থাধ্যয়ন**—নাটক-নভেল পড়া, যে গ্রন্থে বালিকা বা স্ত্রীলোকের

হাবভাব, রূপ-লাবণ্য সম্বন্ধে বর্ণনা আছে—তাহা পড়া। নাস্তিক বা ভগবদ্বিরোধী ভাবপূর্ণ পুস্তক পাঠ। এমন কি ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়নের .ভান করিয়া রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদির অশ্লীল অংশ বা রাধাকৃষ্ণ-লীলা বিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠ করা। ইংরেজী শেখার অজুহাতে ইংরেজী নভেল পড়া।

(৫) **কুচিত্র দর্শন**—বালক, বালিকা ও স্ত্রীলোকের ছবি দেখা (রাধাকৃষ্ণ-লীলা সম্বন্ধীয় হইলেও), সিনেমা, বায়স্কোপ, যাত্রা, থিয়েটার ইত্যাদি দেখা।

(৬) **কুসঙ্গীত**—থিয়েটার, যাত্রা, গ্রামোফোন, রাধাকৃষ্ণ-লীলা-কীর্ত্তন * ইত্যাদি শ্রবণ করা।

ব্রহ্মচর্য্যকামী বালক ও যুবকের উপরোক্ত বিষয়গুলি উত্তমরূপে স্মরণ রাখা ও উহা হইতে সাবধান থাকা একান্ত আবশ্যক। তাহা হইলে "তন্ থির, মন থির, বচন থির," হইবে। অর্থাৎ শরীর, মন ও বাক্য স্থির ও অচঞ্চল হইবে। ফলে বীর্য্য অবিচলিত ও সুস্থির হইবে। তখন ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ বালক ও যুবকের দেহ-মন-প্রাণে বৈদ্যুতিক শক্তি ও অপার্থিব আনন্দ খেলিতে থাকিবে। খেলাধূলা, কাজকর্ম্ম, পড়াশুনা—সর্ব্ববিষয়ে তাহার উদ্যম, উৎসাহ অশেষরূপে বর্দ্ধিত হইবে। মেধা ও প্রতিভার বিকাশে তাহার চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধি চতুর্দ্দিকে খেলিতে থাকিবে। শারীরিক ক্লান্তি ও মানসিক অবসাদ বলিয়া একটি জিনিস সে অনুভব করিবে না।

কিন্তু সাবধান হইতে হইবে যে উপরে বর্ণিত নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের মধ্যে কোনো কোনো বিষয়ে উপকারী ভাব ও আদর্শ থাকিতে পারে। কিন্তু, অনিষ্টের সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে বলিয়া সেই অনিষ্টের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সেগুলিকে একেবারেই বর্জন করিতে হইবে। যেমন যাত্রা, সিনেমা, টকি বা থিয়েটারের মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বা উপকারী ভাব থাকিতে পারে, থাকেও, কিন্তু অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে ঢের। এজন্য তৎসমস্ত সম্পূর্ণ পরিহার করিতে হইবে। কারণ, এক মণ দুধের মধ্যে একবিন্দু গোমূত্র পড়িলেই সমস্ত দুধ নষ্ট হইয়া যায়। আর সুপথ সুচিন্তা অপেক্ষা কুপথ কুচিন্তার পথে,—পাপের পথে—মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অধিক থাকে। সুতরাং, সাধু সাবধান!

উপরোক্ত যে সব বিষয়ের বালক ও যুবকগণকে সাবধান করিয়া দেওয়া

* রাধা-কৃষ্ণলীলা—ভগবৎলীলা—ভক্তের প্রাণারাম অমৃতরস। কিন্তু তরলমতি বালক, বালিকা, যুবক ও যুবতীগণের পক্ষে বিষস্বরূপ।

হইয়াছে—কেহ কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন যে উহার অনেকগুলিই অতিরিক্ত, অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু, তাহাদের অবগতির জন্য বলি—উপরোক্ত প্রত্যেকটি বিষয় ভূয়োদর্শনের অভিজ্ঞতা হইতে গৃহীত, সুতরাং অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

আর একটি কথা—অনেকের যে স্বপ্নযোগে বীর্য্য নষ্ট হয় তার কারণ—কুচিন্তা, কুভাবনাদির জন্য বীর্য্য রক্তবিন্দু হইতে স্খলিত হইয়া কোষমধ্যে সঞ্চিত হয় এবং স্বপ্নযোগে বহির্গত হইয়া যায়। সুতরাং, যে সব বিষয় আপাততঃ বীর্য্যক্ষয়জনক বোধ হয় না, বাস্তবিক কিন্তু সেগুলি স্বপ্নযোগে বীর্য্যক্ষয়ের অন্যতম কারণ।

বীর্য্যধারণেচ্ছু বালক ও যুবকদের সর্ব্বদা চিন্তনীয়

লক্ষ্য কি?—মহামুক্তি, আত্মতত্ত্বোপলব্ধি।
ধর্ম্ম কি?—ত্যাগ, সংযম, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য।
মহামৃত্যু কি?—আত্মবিস্মৃতি।
প্রকৃত জীবন কি?—আত্মবোধ, আত্মস্মৃতি, আত্মানুভূতি।
মহাপুণ্য কি?—বীরত্ব, পুরুষত্ব, মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব।
মহাপাপ কি?—দুর্ব্বলতা, ভীরুতা, কাপুরুষতা, সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা।
মহাশক্তি কি?—ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য, সহিষ্ণুতা।
মহাসম্বল কি?—আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভরতা, আত্মমর্য্যাদা।
মহাশত্রু কি?—আলস্য, নিদ্রা, তন্দ্রা, জড়তা, রিপু ও ইন্দ্রিয়গণ।
পরম মিত্র কি?—উদ্যম, উৎসাহ, অধ্যবসায়।
প্রঃ—কি উপায়ে সর্ব্বদা হৃদয়ে আত্মস্মৃতি জগরূক রাখা যায়?
উঃ—প্রতিনিয়ত আত্মচিন্তা, আত্মবিচারণা, আত্মানুশীলন দ্বারা।
প্রঃ—রিপুর উত্তেজনা ও ইন্দ্রিয়ের উৎপীড়ন হইতে আত্মরক্ষার উপায় কি?
উঃ—নিয়ত মৃত্যুচিন্তা;—দেহের নশ্বরতা এবং জগতের অবাস্তবতা সম্বন্ধে চিন্তার দ্বারা।

প্রঃ—কোন্ কোন্ বিষয় অবলম্বন করিয়া মানুষের মনে কাম-বাসনার উদয় হয়?

উঃ—স্নেহ, মমতা, ভালবাসাকে অবলম্বন করিয়া।

প্রঃ—মানুষের মন দুর্ব্বল হয় কেন?

উঃ— ভোগবিলাসের আকাঙ্ক্ষায়; ইন্দ্রিয়-সুখসম্ভোগের ইচ্ছায় ও বিবেক-বিচার-বৈরাগ্যের অভাবে।

প্রঃ—কি উপায়ে মন সবল, প্রাণ সতেজ হয়?

উঃ—প্রতিনিয়ত বিবেকবুদ্ধি হৃদয়ে জাগাইয়া রাখিলে; ব্যাস বশিষ্ঠ, বাল্মীকি, শুক, শমীক, শঙ্করাচার্য্য জনক, যুধিষ্ঠির, রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, ভীষ্ম, ধনঞ্জয়, শিবি, দধীচি, দিলীপ, দাতাকর্ণ, জীমূত বাহন, হরিশ্চন্দ্র, একলব্য, নচিকেতা, শ্বেতকেতুর বংশধর আমরা,—তাঁহাদেরই পবিত্র শোণিতস্রোত আমাদের ধমনীতে ধমনীতে সঞ্চারিত, প্রবাহিত—এইরূপ চিন্তার দ্বারা আত্মশক্তিতে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আনয়ন দ্বারা।

বীর্য্যধারণের জন্য বালক ও যুবকগণের নিত্য পরিপালনীয়—

“বীর্য্যধারণং ব্রহ্মচর্য্যম্”

শারীরিক ঃ—

১। কায়মনোবাক্যে বীর্য্যধারণের জন্য দৃঢ় সংকল্প ও অবিচলিত অধ্যবসায়ের সহিত চেষ্টা করিবে। দৃঢ় সংকল্পই কার্য্যসাধনের সহায়।

২। অনুত্তেজক লঘুপাক দ্রব্য পরিমিত রূপে আহার করিবে। “ঊনা ভাতে দুনা বল, ভরা পেটে রসাতল”—মনে রাখিবে। মাংস, ডিম, পেঁয়াজ, রসুনাদি আহার করিবে না। নিমন্ত্রণ খাইবে না, দোকানের খাদ্য স্পর্শ করিবে না। স্মরণ রাখা উচিত—ইচ্ছা পূর্ব্বক যে ব্যক্তি বীর্য্যক্ষয় না করে তার পক্ষে ডাল ভাত বা ভাতে সিদ্ধ ভাতই শরীর সুস্থ ও বলিষ্ঠ রাখিবে। আমাদের দেশের একবেলা হবিষ্যান্ন আহারকারিণী বিধবাগণ এ বিষয়ে জ্বলন্ত উদাহরণ। আজকাল বালক ও যুবকগণ এবং তাহাদের শিক্ষক ও অভিভাবকগণ বীর্য্যক্ষয়ের দরুণ শারীরিক

দুর্ব্বলতার দোষ পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবের উপর চাপাইয়া নিশ্চিন্ত। তাহাদের উচিত ভিতরের দিকে দৃষ্টি দিয়া বিবেচনা করা।

একাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও অন্যান্য বিশিষ্ট পর্ব্বাহে উপবাস করিবে। শরীরকে সুস্থ ও মনকে উন্নত এবং চিন্তাশক্তি সম্পন্ন করিতে—এরূপ উপবাস একান্ত আবশ্যক। নির্জলা উপবাস না করিয়া লঘুপাক হাল্‌কা খাদ্য অল্প পরিমাণ খাইতে পার।

৩। **যাবতীয় বিলাসদ্রব্য যত্নের সহিত পরিত্যাগ করিবে।** শরীর রক্ষার উপযোগী সামান্য আহার, বস্ত্র, শয্যা, কাপড়, চাদর ও জামা প্রভৃতি ব্যতীত প্রয়োজনাতিরিক্ত যাহা ব্যবহার করিবে, তাহাই বিলাসিতা, "Plain living and high thinking"—ইহাই ভারতের চিরন্তন আদর্শ।

৪। মাদক দ্রব্য যথা—পান, সুপারী, চা, চুরুট, বিড়ি, তামাক, কফি, জর্দ্দা, নস্য ইত্যাদি—পরিত্যাগ করিবে। জিনিস সামান্য হইলেও এগুলি ব্রহ্মচর্য্যের একান্ত বিরোধী।

৫। কাহারও ব্যবহৃত বস্ত্র ও শয্যাদি অথবা উচ্ছিষ্ট আহার্য্য গ্রহণ করিবে না। এই উপায়ে অপরের শরীরের রোগ পীড়া এবং দূষিত বীজাণু, অপরের চরিত্রের দোষ, ত্রুটি, পাপ তোমার ভিতরে সঞ্চারিত হইবেই। নিজের আহার্য্য, বস্ত্রাদি ও শয্যার বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা রক্ষা করা বীর্য্যধারণের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। নিজের উক্ত দ্রব্যাদি কখনও অপরকে ব্যবহার করিতে দিবে না।

৬। একাকী এক শয্যার শয়ন করিবে। বীর্য্যধারণেচ্ছু বালক যেন কখনও অন্যথা না করে। শয্যার অভাবে বরং মাটিতে শুইবে, অথবা বসিয়া, দাঁড়াইয়া, বেড়াইয়া রাত্রি কাটাইবে, তবু কদাপি অন্যের সহিত এক শয্যায় শয়ন করিবে না। কখনও উপুড় হইয়া শুইবে না। চিৎ হইয়া শয়ন করিবে।

৭। ৫ ঘন্টার অধিক নিদ্রা যাইবে না। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ৫ ঘন্টা নিদ্রাই যথেষ্ট। রাত্রি দশটা হইতে তিনটা পর্য্যন্ত ঘুমাইবার উৎকৃষ্ট সময় রাত্রির শেষ প্রহরে না ঘুমাইয়া জপ, ধ্যান, স্তবস্তুতি পাঠ ও পড়াশুনা করা উচিত। শেষ রাত্রিতেই বীর্য্যক্ষয় হয়। রাত্রি ৩-৩.৩০টার পরে যাহারা ঘুমায়, বীর্য্যধারণ তাহাদের পক্ষে বিশেষ কষ্টকর। অপ্রয়োজনে রাত্রি জাগরণ করিবে না। রাত্রি ৩-৩.৩০ টার সময় নিদ্রা ভঙ্গ হইলে আর কদাপি ঘুমাইবে না। দিবানিদ্রা—সদ্যঃ সংযমনাশক ও পাপ।

৮। সর্ব্বদা কৌপীন বা লেঙ্গট পরিধান করিবে। লিঙ্গকে উপরের দিকে এবং কোষকে লম্বমান রাখিয়া সজোরে কৌপীন পরিতে হইবে। কৌপীন

ব্যবহার বীর্য্যধারণের বিশেষ সহায়ক। একজোড়া কৌপীন করিলে একটা পরিয়া অন্যটি ধুইয়া দেওয়া যাইবে। এই রূপে কৌপীন ২৪ ঘন্টাই পরিধান করা আবশ্যক। পশ্চিমাঞ্চলে দেখিয়াছি—শিশু ও বালকগণকে কাপড় না পরাইয়া সাধারণতঃ কৌপীন পরাইয়া অভিভাবকগণ খেলাধূলা করিয়া বেড়াইতে ছাড়িয়া দেন। এই প্রথা এদেশেও হওয়া উচিত।

৯। দিনে দুইবার—সকালে ও বৈকালে—নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম করিবে। যাহাদিগকে সাংসারিক কাজকর্ম্মে কঠিন শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয়, তাহাদিগকেও অন্ততঃ একবেলা ব্যায়াম করা উচিত। ব্যায়ামে নিয়মাচারী হওয়া চাই। একদিন করিলাম, একদিন করিলাম না—এমন করা অনিষ্টকর।

ফুটবল, ব্যাডমিন্টন, টেনিস, হকি—ইত্যাদি খেলা ব্যয়সাধ্য এবং আমাদের দেশ ও স্বাস্থ্যের প্রতিকূল। সুতরাং বালকগণ দেশী খেলা করিবে এবং বুকডন, বৈঠক, ডাম্বেল, মুগুর ইত্যাদি ব্যায়াম করিবে। অল্পে অল্পে আরম্ভ করিয়া প্রত্যহ ধীরে ধীরে ব্যায়ামের পরিমাণ বাড়াইতে হয়।

অনেক বালক ও যুবকের বিশ্বাস যে ব্যায়াম করিলে পুষ্টিকর খাদ্য দরকার। একথা ঠিক নয়। ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা হইতেই বলি—**যে ব্যক্তি সংযত এবং বীর্য্যক্ষয় ইচ্ছাপূর্ব্বক করে না, ডাল, ভাত, তরকারী খাইয়াও সে দু'বেলা প্রচুর ব্যায়াম করিয়া শরীরকে বলিষ্ঠ ও নীরোগ রাখিতে পারিবে।** পুষ্টিকর খাদ্যের অজুহাতে—কখনও মাংস, ডিম ইত্যাদি খাইয়া নিজের সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিও না। ও-গুলিকে বিষের ন্যায় পরিত্যাগ করিবে।

ব্যায়ামের অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে বা পরে ভিজান ছোলা মাত্র একমুষ্টি একটু লবণ বা ইক্ষুগুড় দিয়া খাইবে। সাধারণ ব্যায়ামের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট।

ব্যায়াম শরীরের মাংসপেশীকে লৌহদৃঢ় এবং স্নায়ুমণ্ডলীকে ইস্পাতকঠিন করে। ব্যায়ামে শরীরের সর্ব্বত্র দ্রুত সঞ্চালন হেতু Oxygen শরীরে প্রবেশ করিয়া রক্ত বিশুদ্ধ করে ও রোগের বীজ নষ্ট করে। ব্যায়ামে ভুক্ত দ্রব্য সহজে উত্তমরূপে জীর্ণ হয়। সুতরাং, অম্ল, অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্যাদি ব্যাধি হয় না। ঘর্ম্মের সহিত প্রচুর ময়লা বাহির হইয়া যায়। ব্যায়ামে সুনিদ্রা হয়। বস্তুত, বীর্য্যধারণে ইচ্ছুক বালক ও যুবককে নিয়মিত ব্যায়ামশীল হইতে হইবে। ব্যায়ামশীল যুবকের দেহ-মনে স্বাস্থ্যজনিত এক প্রকার আনন্দ ও আত্মপ্রসাদ জন্মে—উহা তাহাকে অনেক অচিন্তা, কুচিন্তা, অশান্তি প্রভৃতি হইতে রক্ষা করিয়া থাকে।

১০। কাহারও শরীর বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি স্পর্শ করা—বীর্য্য ধারণের একান্ত

বিরোধী। খেলাধূলার ছলেও উহা করা অনুচিত। একত্র গায়ে গায়ে ঠেকাইয়া বসা, কাহারও কোলের উপর বসা, কাহারও সহিত গলাগলি হইয়া থাকা বা বেড়ান, আমোদ-প্রমোদের ছলে কাহারও সহিত জড়াজড়ি, মারামারি প্রভৃতি করা—এ সকলের মত সংযমনাশক আর কিছুই নাই। যুবক ও বালকগণকে এ বিষয়ে একটু অতিরিক্ত সাবধান হইতে পরামর্শ দেই। বালক-বালিকাগণকে আদর পূর্ব্বক কোলে করিয়া স্নেহ-মমতা-ভালবাসা দেখাইতে যাইয়া নিজের সদ্যঃ সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিও না। সাবধান!

১১। ইচ্ছাপূর্ব্বক কখনও স্ত্রীলোকের মুখের দিকে তাকাইবে না, এমন কি প্রয়োজনে বালক-বালিকার মুখের দিকেও তাকাইবে না। বালক, বালিকা ও স্ত্রীলোক মায়ার পুতুল, উহাদের অজ্ঞাত আকর্ষণ অত্যন্ত ধীর ও দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তি ভিন্ন কেহ এড়াইতে পারে না। প্রয়োজন ভিন্ন দৃষ্টি সর্ব্বদা অধোদিকে রাখিবে। জানিও "দৃষ্টিরেব সৃষ্টিঃ!" ব্রহ্মচারী রামানুজ লক্ষ্মণ আজীবন সীতার সহিত বাস করিয়া এবং সীতার সেবাশুশ্রূষায় কাটাইয়াও কদাপি তাঁহার মুখের দিকে তাকান নাই;—একথা তোমরা রামায়ণে পড়িয়াছ; স্মরণ রাখিও।

১২। অপ্রয়োজনে কথা বলিবে না। কথা বলার অনেক দোষ, কথা না বলার অনেক গুণ। কথা দ্বারাই লোকের সহিত নিকট সম্বন্ধ ঘটে। সুতরাং, কথা যত কম বলিবে ততই অপরের প্রভাব হইতে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইবে। কুসঙ্গ ও পাপের হাত হইতে আত্মরক্ষার সর্ব্বোচ্চ উপায় বাক্‌সংযম। বাক্‌সংযমে মানসিক শক্তি ও তেজঃ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়, স্মৃতিশক্তি প্রবল হয়, গাম্ভীর্য্য ও শক্তিতে মন ভরিয়া থাকে; বিপদাপদে অশান্তিতেও মানসিক চঞ্চলতা বা কার্য্যে বিশৃঙ্খলতা আসে না, গণিয়া গণিয়া কথা বলা উচিত।

কৃপণ যেমন অত্যধিক আগ্রহ সহকারে টাকা পয়সা সঞ্চয় করে এবং অত্যন্ত আবশ্যক হইলেও ব্যয়ের সময়ে অতি কষ্টে অল্প অল্প ব্যয় করে; বালক ও যুবকগণ তেমনি বীর্য্য ও বাক্য যত্নপূর্ব্বক সঞ্চয় করিবে; অনিচ্ছার সহিত প্রয়োজন মত ২।৪টি মাত্র কথা কহিবে।

১৩। সর্ব্বদা কোন না কোন কার্য্যে (শারীরিক বা মানসিক) ব্যাপৃত থাকিবে। Idle brain is the devil's workshop—অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা। মানুষের মন কখনও খালি থাকিতে পারে না। সুচিন্তা বা সৎকার্য্যের সঙ্কল্প যদি মনের ভিতর সর্ব্বদা না থাকে তবে তাহার স্থানে অসৎ ভাব-চিন্তা জাগিয়া তোমাকে অসৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইবে। সুতরাং রুটীন তৈরী করিয়া তদনুযায়ী সর্ব্বদা কোন না কোন কার্য্যে লাগিয়া থাকা চাই।

"ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ"

মানসিক ঃ—

১। মনকে সর্ব্বদা সৎচিন্তা, সৎভাবনা, সৎসঙ্কল্প, সৎগ্রন্থাধ্যয়ন, ভগবানের নামজপ, রূপধ্যান, প্রার্থনা ও স্তবস্তুতি পাঠ ইত্যাদি দ্বারা ব্যাপৃত রাখিবে। প্রত্যহ প্রত্যুষে, সন্ধ্যায় ও শয়নের পূর্ব্বে কিছু সময় জপ-ধ্যান ও প্রার্থনা, স্তব ও গীতার কয়েকটি শ্লোক পাঠ করিবে।

২। কদাপি মনে কুচিন্তা আসিলে ইষ্টদেবতার নামজপ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে ও ভগবৎ সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে।

৩। শয়নের অব্যবহিত পূর্ব্বে অন্য যাবতীয় চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া নামজপ, প্রার্থনা, ধ্যান করা চাই। শয়নের সময়ে কুচিন্তা মনে স্থান দিলে বীর্য্য রক্ষা কিছুতেই হইবে না!

৪। প্রত্যহ গীতাদি ধর্ম্মগ্রন্থ অবসর সময়ে পাঠ করিবে ও অন্ততঃ একটি করিয়া শ্লোক মুখস্থ করিবে।

৫। প্রত্যহ অন্ততঃ দুই ঘন্টা জপ ও প্রার্থনা করা চাই।

৬। শয়নের পূর্ব্বে প্রত্যহ আত্মপরীক্ষা করিবে ও নিয়মিত ডায়েরী রাখিবে।

ব্রহ্মচর্য্যকামী বালক ও যুবকের নিত্য কৃত্য ঃ—

১। প্রত্যুষে (গ্রীষ্মকালে) ৩টার সময়ে, (শীতকালে) ৪টার সময়ে শয্যা ত্যাগ করিবে। ব্রহ্মচর্য্যকামীর পক্ষে প্রাতরুত্থান একান্ত আবশ্যক। রাত্রির শেষে যে ব্যক্তি নিদ্রায় অভিভূত থাকে তার বীর্য্য কিছুতেই রক্ষিত হইতে পারে না। নিদ্রাভঙ্গে কিছুক্ষণ শয্যায় বসিয়াই নামজপ ও প্রার্থনা অথবা স্তোত্রপাঠ করিবে।

প্রত্যুষকালীন বায়ু অতি পবিত্র ও সুনির্ম্মল, ইহাতে শরীর-মন স্নিগ্ধ, সতেজ ও পবিত্র ভাবে পূর্ণ হয়। মুসলমান সাধকগণ বলেন—এই সময়ের বাতাস স্বর্গ হইতে ভগবানের সংবাদ ভক্তদের নিকট এবং ভক্তদের সংবাদ ভগবানের নিকট পৌঁছাইয়া দেয়। হিন্দুশাস্ত্রে উক্ত আছে—এই সময়ে দেবতা ও মহাপুরুষগণ অলক্ষ্যে বাহির হয়েন।

২। ৩.৩০ ঘটিকার (শীতকালে ৪.৩০) মধ্যে মলমূত্রাদি ত্যাগ, ব্যায়াম, দন্তধাবন ও স্নান বা বস্ত্রাদি পরিবর্তন করিবে। মলমূত্রের বেগ কখনও রোধ করিতে নাই; অথবা অনিয়মিতভাবে যেদিন যখন ইচ্ছা পায়খানায় যাওয়াও ঘোরতর স্বাস্থ্যবিরোধী। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যার পূর্ব্বে—দুইবার পায়খানায় যাওয়া উচিত, বেগ থাকুক বা নাই থাকুক। কোষ্ঠ পরিষ্কার না থাকা বীর্য্যক্ষয়ের

অন্যতম কারণ, প্রত্যহ উত্তম রূপে দন্তধাবন আবশ্যক। দন্তাদি অপরিষ্কার থাকিলে নানা প্রকার ব্যাধি উৎপন্ন হইতে পারে। দাঁতন দিয়া দাঁত মাজিতে পারিলেই সর্ব্বোত্তম।

৩.৩০টা হইতে ৪.৩০টা পর্যন্ত (শীতকালে ৫.৩০ পর্যন্ত) একটি নির্দিষ্ট ঘরে ও নির্দিষ্ট আসনে বসিয়া নামজপ, ধ্যান, প্রার্থনা ও গীতাপাঠ করিবে। নিকটে যদি কোন মন্দির থাকে তবে সেখানে গিয়াও করিতে পার। অন্যথা নিজের পড়িবার বা শয়নের ঘরেই করিবে। জপের সংখ্যা রাখিতে হইবে এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক জপ প্রত্যহ করিতে হইবে। মালা থাকিলে ভাল, অন্যথা হাতেই সংখ্যা রাখিবে।

৪। ইচ্ছা করিলে ৪.৩০টার পরে (শীতকালে ৫.৩০টার পরে) অর্দ্ধ ঘন্টা রাস্তায় বা মাঠে, খোলা বাতাসে একাকী নীরবে ভগবানের নাম করিতে করিতে ভ্রমণ করিবে; ভ্রমণের সঙ্গী থাকিলেও কথা কহিবে না।

৫। ৫টা হইতে (শীতকালে, ৬টা হইতে) ৯.৩০ পর্য্যন্ত একাগ্র মনে পাঠ্য পুস্তকাদি অধ্যয়ন করিবে। স্থানটি একটু নিরিবিলি হইলেই ভাল হয়। পড়িতে বসিয়া বার বার উঠা, এদিক ওদিক তাকান বা মধ্যে মধ্যে কাহারও সহিত কথা বলা—অত্যন্ত অন্যায়; ইহাতে সময় নষ্ট, শক্তি নষ্ট, পড়াশুনায় কিছু ফল হয় না। পাঠে বসিবার সময় চিন্তা করিয়া নিয়া বসিবে—এই কয় ঘন্টার মধ্যে আমার অন্য কোনো কাজ, অন্য কোনো চিন্তার দরকার নাই। পাঠ শেষ হইলে পর সেই স্থান হইতে উঠিও, পাঠের সময় অন্যদিকে চাহিও না, অন্য ব্যাপারে কর্ণপাত করিও না। এরূপ ভাবে পাঠ করিলে দুই দিনে দুই মাসের পাঠ আয়ত্ত করা যায়—ইহা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা।

১। ৯.৩০টা হইতে ১০.৩০টার মধ্যে পারিবারিক কাজকর্ম্ম কিছু থাকিলে তা, শেষ করিয়া স্নানান্তে আহার করিবে। আহার করিবার সময়ে শুচি ও মৌন হইয়া খাদ্য দ্রব্য ভগবানকে মনে মনে নিবেদন করিয়া প্রতি গ্রাসেগ্রাসে নাম স্মরণ করিতে করিতে আহার করিবে। চিন্তা করিবে পবিত্র ভগবৎ-প্রসাদ ভক্ষণে পবিত্র বীর্য্য উৎপন্ন হউক।

৭। তারপর বিদ্যালয়ে গমন করিবে, শিক্ষকের নিকটে বিনীত, প্রশান্ত ও আজ্ঞাবহ থকিবে। সহপাঠীদের সহিত কোন প্রকার গোলযোগ বা গল্পাদি করিয়া পাঠের ব্যাঘাত করিবে না। ক্লাসের নির্দিষ্ট স্থানে প্রত্যহ বসিবে। বসিবার সময়ে মেরুদণ্ড সরল রাখিয়া বসিবে। এরূপ বসিতে প্রথমে ক্লেশ বোধ হইলেও অভ্যাসের দ্বারা সহজ হইবে। শিক্ষকের কথা একাগ্র মনে শুনিবে। ক্লাসে অপ্রয়োজনীয় কথা না বলিয়া যথাসম্ভব মৌন হইয়া থাকিবে। ক্লাসে আসিবার

ও যাইবার সময়ে শিক্ষক মহাশয়কে প্রণাম বা নমস্কার করিবে।

৮। বিদ্যালয় হইতে বাটিতে আসিয়া সময় থাকিলে সদ্গ্রন্থ পাঠ করিবে। গৃহের কার্য্যাদি থাকিলে তাহা করিবে। পরে অর্দ্ধ ঘন্টাকাল ব্যায়াম করিবে, পরে কিছুক্ষণ ভ্রমণ করিবে।

৯। পরে স্নানাদি করিয়া বা হাত মুখ ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া সন্ধ্যা ৬.৩০টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত (শীতকালে ৫.৩০ হইতে ৬.৩০টা) নামজপ, ধ্যান ও প্রার্থনা করিবে।

১০। সন্ধ্যা ৭টা হইতে (শীতকালে ৬টা হইতে) রাত্রি ১০টা পর্যন্ত একাগ্র মনে অধ্যয়ন করিবে। ইহার পূর্ব্বে প্রয়োজন হইলে আহার করিবে। ১৫ মিনিট আহার ও ১৫ মিনিট বিশ্রাম, পরে পড়িবে। রাত্রিতে অর্দ্ধ ভোজন বিধেয়।

১১। রাত্রি ১০/১০.৩০টা হইতে (শীতকালে ১১/১১.৩০টা হইতে) নিদ্রা যাইবে। শয্যায় বসিয়া নিদ্রাবেশ না হওয়া পর্য্যন্ত নামজপ করিবে। চিৎ হইয়া সরলভাবে শয়ন করিবে। শয়নের সময়ও কৌপিন পরিধানে থাকিবে। শয়নের সময়ে যাহাতে কোন প্রকারের কুচিন্তা বা বাজে চিন্তা না আসে এজন্য নামজপ করিবে।

ছুটির দিনেও এই সব নিয়ম পালন করিবে, কেবল মাত্র যে সময়টা স্কুলে বা কলেজে কাটিত সে সময়টা পুরাতন পাঠের পুনরাবৃত্তি ও সদ্গ্রন্থ পাঠে অতিবাহিত করিবে। কোনো সদ্গ্রন্থ পাঠ কালে তার বিশেষ বিশেষ ভাল অংশ নোটবুকে লিখিয়া রাখিবে ও মুখস্থ করিবে। ভাল ভাল সংস্কৃত স্তোত্র ও শ্লোক মুখস্থ করিবে ও মধ্যে মধ্যে আপন মনে আবৃত্তি করিবে। তাস, পাশা, দাবা ইত্যাদিতে কখনও যোগ দিবে না।

অবসর সময়ে পাঠের জন্য, ব্রহ্মচর্য্যকামী বালক ও যুবকগণের জন্য নিম্নে কতকগুলি পুস্তকের নাম করা যাইতেছে। অন্য কোনো বাইরের বই পড়ার পূর্ব্বে এইগুলি তাহাদিগকে পাঠ করিতে হইবে।

১। ভারতের সাধক—শঙ্করনাথ রায়।
২। বিবেকানন্দচরিত—সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার।
৩। সাধু নাগ মহাশয়—শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
৪। ভক্তিযোগ—অশ্বিনীকুমার দত্ত।
৫। স্বামী-শিষ্য-সংবাদ—শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
৬। পত্রাবলী (সমস্ত খণ্ডগুলি)—স্বামী বিবেকানন্দ।
৭। ভক্তিরহস্য— ঐ
৮। Complete works of Swami Vivekanenda in several parts.

৯। ভারতে বিবেকানন্দ—
১০। শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত— শ্রীম
১১। পরিব্রাজকের বক্তৃতা—স্বামী কৃষ্ণানন্দ।
১২। শ্রীকৃষ্ণপুষ্পাঞ্জলি— ঐ
১৩। গীতা—স্বামী কৃষ্ণানন্দ।
১৪। ভক্তি ও ভক্ত— ঐ

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ হইতে প্রকাশিত ঃ—

১৫। ব্রহ্মচর্য্যম্
১৬। গার্হস্থ্যম্
১৭। "প্রণব" মাসিক পত্রিকা
১৮। সঙ্ঘ-বিষাণ (কবিতা)
১৯। শ্রীশ্রীযুগাচার্য্য-সঙ্গ ও উপদেশামৃত
২০। সাধনবাণী
২১। ওঁ শ্রীশ্রীজগদ্গুরু
২২। শ্রীশ্রী সদ্গুরু
২৩। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা
২৪। শ্রীশ্রীযুগাচার্য্য-জীবন-চরিত
২৫। সঙ্ঘগীতা
২৬। শ্রীশ্রীগুরুগীতা
২৭। জীবনসাধনার পথে
২৯। হিন্দুত্বম্
৩০। পাথেয়
৩১। শ্রীশ্রীকৃষ্ণ
৩২। গুরুমুখী মহাভারত
৩৩। গুরুমুখী রামায়ণ
৩৪। শ্রীগীতা (গুরুমুখী)
৩৫। মনীষীদের দৃষ্টিতে স্বামী প্রণবানন্দ
৩৬। শ্রীশ্রীসদ্গুরু
৩৭। শ্রীশ্রীপ্রণবানন্দ—শতরূপে, শতমুখে (তিনখণ্ডে)
৩৮। ছাত্রদের রামায়ণ
৩৯। ছাত্রদের মহাভারত

ব্রহ্মচর্য্যপালন বা বীর্য্যধারণের সহায়—

সৎসঙ্গ

জীবনগঠনের পক্ষে সৎসঙ্গই সর্ব্ব প্রধান সহায়। সৎসঙ্গে জীবনকে সৎ এবং মহৎ করিয়া তুলিবার আকাঙক্ষা জাগে। সৎসঙ্গে হৃদয়ের সদ্‌বৃত্তি সকল প্রস্ফুটিত ও পরিপুষ্ট হয়। চারা গাছকে যেমন বেড়া দিয়া না ঘিরিলে গরু ছাগলে খাইয়া নষ্ট করে, তেমনি জীবনকে সৎসঙ্গ রূপ বর্ম্মে আবৃত না করিলে কুসঙ্গ ও প্রলোভনরূপ শত্রুর হস্তে নষ্ট হইয়া যাইবেই।

সৎসঙ্গের মাহাত্ম্যে কীর্ত্তিবাসী রামায়ণোক্ত দস্যু রত্নাকর এক মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইয়া পরিশেষে মহর্ষি বাল্মীকি হইয়াছিলেন; নরাধম জগাই মাধাই এক মুহূর্ত্তে দীনহীন ধর্ম্মপ্রাণ কাঙ্গাল হইয়া গেল। আর চক্ষের উপর প্রতিনিয়ত দেখিয়াছি কত শত জগাই মাধাই শ্রেণীর ব্যক্তি শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের চরণস্পর্শে মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে।

নারদ ঋষি তার ভক্তিসূত্রে বলিয়াছেন—"ভগবানের কৃপা অথবা মহতের কৃপা ছাড়া ভক্তি লাভ হয় না"—ভগবানের কৃপালাভ—তাহাও মহতের অনুগ্রহ ভিন্ন হয় না। সুতরাং, যেন তেন প্রকারেণ—মহতের আশ্রয় গ্রহণ কর।

জপঃ

বীর্য্যধারণেচ্ছুর পক্ষে নাম জপই প্রধান সহায়। নামের দ্বারা শরীর মন শুদ্ধ ও পবিত্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বীর্য্য ধারণ সহজ হইয়া আসিতে থাকে। সুতরাং, নিয়মিত ভাবে জপ প্রত্যহ করিতে হইবে। নির্জ্জন স্থান বা নির্জ্জন ঘরে বসিয়া একাগ্র মনে জপ করিতে হইবে। যিনি দীক্ষিত তিনি ইষ্টমন্ত্র জপ করিবেন,

যিনি গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত তিনি গায়ত্রী জপ করিবেন। আর যিনি দীক্ষিত হন নাই, তিনি যে নাম ভাল লাগে "ওঁ"-কারের সহিত সেই নাম জপ ও সেই মূর্ত্তি ধ্যান করিবেন।

জপের সময়ে শরীরকে স্থির, বক্ষঃ, গ্রীবা ও মস্তক সমরেখায় ও মেরুদণ্ড সরল রাখিয়া (মন যাহাতে কোনো কারণে চঞ্চল হইতে না পারে) জপ করিতে হইবে। জপ মনে মনে করিবে না, উচ্চরবেও করিবে না, নিজে বোঝা যায় অথচ অপরে শুনিতে না পায়—এমনি ভাবে শব্দ না করিয়া শুধু জিহ্বা দ্বারা জপ করিবে।

একবার শ্বাস গ্রহণ করিয়া ১০ বা ২০ বা ৩০ যে কয়বার সম্ভব—জপ করিবে, শ্বাস শেষ হইলে পুনর্ব্বার নিঃশ্বাস গ্রহণ পূর্ব্বক ঐরূপ সংখ্যা জপ করিবে। মালা থাকিলে মালায় অন্যথা দু'হাতে সংখ্যা রাখিবে। সংখ্যা রাখিয়া জপ না করিলে জপের উপকারিতা বিশেষ নাই। প্রতিশ্বাসে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক জপ করিবে প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট কয়েক সহস্র জপ করা চাই এবং কিছু কিছু বাড়াইতে চেষ্টা করিতে হইবে। জপের সময়ে মানস নেত্রে ইষ্টমূর্ত্তি অবলোকন করিতে থাকিবে। যাঁর কোনো দেবমূর্ত্তি ভাল লাগে না বা তাহাতে মন স্থির হয় না, তিনি শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের মূর্ত্তি ধ্যান-চিন্তা করিতে পারেন। জপের সময়ে মন চঞ্চল বা অস্থির হইলে নিরাশ হইও না। অনভ্যস্ত মন এরূপ বিদ্রোহ করিবেই। জপ করিতে করিতে ধীরে ধীরে মন বশীভূত হইবে। মন চঞ্চলতার দিকে কিছুতেই খেয়াল করিবে না। তোমার কর্ত্তব্য তুমি একমনে করিয়া যাইবে। এজন্য কোন একটি আসন অভ্যাস করা আবশ্যক। পদ্মাসন সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অথবা, যে আসনে অধিকক্ষণ এক ভাবে বসিতে পার সেই আসনে বসিবে। মোটের উপর—মেরুদণ্ড স্থির ও সরল রাখিতে হইবে ও জপ আরম্ভ হইতে শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ঠিক একই ভাবে বসিয়া থাকিতে হইবে।

বাম উরুর উপর দক্ষিণ পদ এবং দক্ষিণ উরুর উপর বাম পদ (cross-wise) রাখিয়া বসাই পদ্মাসন।

প্রার্থনা ঃ—

প্রার্থনা—জীবনের অমৃতরসায়ন, প্রার্থনা—নিরাশ প্রাণে আশার আলো আনিয়া দেয়, অবসন্ন বুকে ভরসার বল সঞ্চার করে, অশান্তিপূর্ণ জীবনে শান্তির অমৃত সঞ্চার করে। সংসারের জ্বালা-মালায় যখন প্রাণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে, অন্তরের

রিপুকুলের উৎপীড়নে যখন জীবন নরকতুল্য বিভীষণ যন্ত্রণাগার হইয়া দাঁড়ায়, চারিদিকে বন্ধু-বান্ধব যখন স্বার্থের কোলাহলে কর্ণ বধির করিয়া তোলে, প্রলোভনের কুহকে মজাইয়া অবিরত পাপের পথে আকর্ষণ করিতে থাকে, মৃত্যুই যখন পরম বান্ধব এবং আত্মহত্যাই তাহার দ্বিতীয় উপায় বলিয়া মনে হইতে থাকে, তখন একবার করুণাসিন্ধু, আৰ্ত্তের আশ্রয় ভগবানের চরণে প্রাণ ভরিয়া কাঁদ, প্রার্থনা কর, প্রাণের কবাট উন্মুক্ত করিয়া অশ্রুজলে বক্ষঃ সিক্ত কর—দেখিবে অকস্মাৎ কি যেন কি অভিনব শক্তি ও শান্তিতে হৃদয়-মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এমনি করিয়া প্রত্যহ তাঁর অভয় চরণে শরণ গ্রহণ ও প্রার্থনা করিতে অভ্যাস কর,—দেখিবে জীবনে তোমার যা কিছু কাম্য সমস্তই পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। পাপের জ্বালার অবসান হইয়া পুণ্যের মধুময় বাতাসে শরীর-মন স্নিগ্ধ ও শান্তিময় হইয়া উঠিতেছে। একজন সাধক তাই বলিয়াছেন—"মায়ের ঘরে অনেক ধনরত্ন আছে; প্রার্থনা সে সিন্দুকের চাবিকাঠি; ঐ চাবিকাঠি হস্তগত কর, ধনরত্নে তোমার হৃদয়গৃহ পরিপূর্ণ হইবে।" বড় কথা—ব্রহ্মচর্য্য পালন ও বীর্য্যধারণের সামর্থ্য লাভ করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে প্রত্যহ প্রার্থনা কর। কেবলমাত্র নিজের চেষ্টায় কেহ বীর্য্যধারণে সমর্থ হয় না। নিজের প্রবল চেষ্টার সহিত ভগবানের অনুগ্রহ ও আশীর্ব্বাদ একান্ত প্রয়োজনীয়। তাই ব্যাকুল প্রাণে তাঁর নিকট সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতে থাক; ধীরে ধীরে সব সহজ হইয়া আসিবে।

সঙ্কল্প ঃ—

সুদৃঢ় সঙ্কল্পই সাধনার সর্ব্বপ্রথম অবলম্বন। সঙ্কল্পের দৃঢ়তা না থাকিলে সাধনায় কৃতকার্য্য হওয়ার আশা বৃথা। কায়মনোবাক্যে দেবতা, পূর্ব্বতন ঋষি ও মহাপুরুষগণ এবং বিশেষভাবে শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের কৃপা ভিক্ষা করিয়া বীর্য্যধারণের জন্য সঙ্কল্প কর এবং বুদ্ধদেবের মত প্রতিজ্ঞা কর—"যদি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পাপে পরিপূর্ণ হইয়া যায়, লক্ষ কোটি শয়তান যদি মেরু পর্ব্বত সদৃশ খড়্গ হস্তে আমার বিনাশে অগ্রসর হয়; তবুও তাদের সাধ্য নাই যে আমার সঙ্কল্পের সুদৃঢ় বর্ম ভেদ করিয়া আমার দেহে আঘাত করিতে পারে; আমাকে সঙ্কল্পিত সাধনা হইতে বিচলিত করিতে পারে।" সাধনার পথ পুষ্পাস্তীর্ণ নয়, বাধাবিঘ্ন অবিরত পথ আগুলিয়া আছে। সুতরাং, সঙ্কল্প ও সত্য রক্ষা জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে। মনে প্রাণে সর্ব্বদা এরূপ চিন্তা-ভাবনা থাকিবে—

"সঙ্কল্প হতে বিচলিত হওয়ার পূর্ব্বে আমার এই শরীর ধ্বংস হয়ে যাক্।"

মাতৃভাবে ভগবদুপাসনা :—

"মা" নামটী বড় মধুর, এমন 'মনমাতান' 'প্রাণগলান' 'সুধামাখা' নাম জগতে আর নাই। 'মা' নামে কী যে শক্তি, কী যে শান্তি, কী যে অমৃত—কে বলিবে? শ্রবণে, স্মরণে, উচ্চারণে প্রাণের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত আনন্দপুলকে কণ্টকিত হইয়া উঠে; হৃদয়—ভক্তি ও পবিত্রতার রসে অভিসিঞ্চিত হয়, মন-প্রাণ শান্তিতে ভরিয়া যায়, রোগে, শোকে, দুঃখে, আপদে; বিপদে, গৃহে, প্রবাসে—শান্তি ও আনন্দ দিতে এমন জিনিস আর নাই। ভগবানকে "মা" বলিয়া ডাকিতে শিখ, মাতৃভাবে ভগবানের চরণে শরণ গ্রহণ কর। ভক্তি, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, নির্ভরতা লইয়া বিশ্বজননীর চরণে আশ্রয় গ্রহণ কর, ধ্যান কর, প্রার্থনা কর, আবদার কর, অশ্রুজলে বক্ষঃ সিক্ত করিয়া কাঁদ। হৃদয় পবিত্রতার মাধুর্য্যে অমৃতময় হইবে। বিশ্বজগতের সব কিছুতে সেই বিশ্বজননীর অধিষ্ঠান ভাবনা কর। জগতের যাবতীয় স্ত্রীকে জগজ্জননীর সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি ভাবনা কর। প্রাণের যাবতীয় কুভাব, কুপ্রবৃত্তি দমিত হইয়া পবিত্রতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে।

মৃত্যুচিন্তা :—

যে ঘুমাইয়া আছে তাহাকে জাগান কঠিন নয়, কিন্তু জাগিয়া যে ঘুমাইবার ভান করে, তাহাকে জাগান বড় শক্ত। ইতর জীব অজ্ঞানাচ্ছন্ন, বিচার-শক্তিহীন,—প্রবৃত্তির বশে চালিত। কিন্তু মানব! তুমি মননশীল, চিন্তাশীল, হিতাহিত-বোধসম্পন্ন—তাই না তুমি মানুষ! তুমিও কি পশু-পক্ষীর ন্যায় নিশ্চিন্ত হইয়া আহার-নিদ্রা নিয়া ব্যস্ত থাকিবে? এ জগতে মৃত্যুর ন্যায় সত্য আর কিছুই নাই। তুমি—ধনজন, স্ত্রীপুত্র,—যাহা আজ আছে, কাল নাই—তাহাকে লইয়া মাথা ঘামাইতেছ, আর মৃত্যু যে তোমার কেশ ধরিয়া টানিতেছে, কখন কোন্ মুহূর্ত্তে তোমার উপর শমনরাজের শমন জারি হইবে তাহার ঠিক নাই, তবুও তুমি নিশ্চিন্ত মনে কাল হরণ করিতেছ। শাস্ত্র বলিতেছেন :—

আসুপ্তেরামৃতেঃ কালং নয়েৎ বেদান্তচিন্তয়া।
কো হি জানাতি কস্যাদ্য মৃত্যুকালো ভবিষ্যতি।।

যতক্ষণ না ঘুমাও, যতক্ষণ মৃত্যু আসিয়া তোমাকে গ্রাস না করিতেছে, ততক্ষণ শাস্ত্র ও ভগবচ্চিন্তায় রত থাক, কে জানে কখন কাহার মৃত্যু ঘটিবে। কিন্তু, মানব চোখের উপর নিত্য নিয়ত শত শত প্রাণপ্রিয় আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবকে

মৃত্যুর দুয়ারে অতিথি হইতে দেখিয়াও ভাবে না, বুঝে না যে তাহাকে একদিন অকস্মাৎ এমনি ভাবে সমস্ত ছাড়িয়া মৃত্যুপথের পথিক হইতে হইবে। তাইতো ধর্ম্মরাজের প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন—"জীবকুল অহরহঃ যমভবনে গমন করিতেছে, কিন্তু অপর সকলে মনে করিতেছে যেন তাহারা চিরস্থায়ী, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য কি?"

মানব! আজ তুমি যে সুন্দর, সুঠাম, সুস্থদেহের গর্ব্ব করিতেছ, কত অলঙ্কারে তাহাকে ভূষিত করিতেছ, দর্পণে শতবার শতভাবে দেহকে অবলোকন করিয়া উৎফুল্ল হইতেছ, জান না—রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে ভীষণ ওলাউঠা রোগে এই দেহের ধ্বংস সাধন হইতে পারে, তখন তো শ্মশানশয্যায় একমুষ্টি ভষ্ম ভিন্ন তার কোন অস্তিত্ব থাকিবে না। মৃত্যু তো কাহাকেও সংবাদ দিয়া আসে না, মৃত্যু আসে অলক্ষিতে, আচম্বিতে। যে দেহের এরূপ পরিণাম—সেই দেহের—সেই ইন্দ্রিয়ের সুখসম্ভোগের জন্য তুমি মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়া অবিরত পাপে রত হইয়া নরকের পথে ছুটিতেছ!

হায় মুর্খ! তোমার দেহ যে চিরস্থায়ী নয়! এমন দিন যে কোন মুহূর্ত্তে আসিতে পারে যখন তোমার চক্ষু আর দেখিবে না, কর্ণ শ্রবণ করিবে না, হস্ত গ্রহণ করিবে না, পদ চলিবে না, চিহ্বা বাক্য উচ্চারণ করিবে না। তাই অবোধ, তোমাকে লক্ষ্য করিয়া সাধু তুলসীদাস কি বলিতেছেন শোন ঃ—

শোতে শোতে ক্যা কর ভাই ওঠো ভজ মুরার।
এয়সা দিন আতে হ্যায় যব লম্বা পাও পসার।।

ভাই! শুইয়া শুইয়া কি কর! ওঠো, শ্রীহরির ভজন কর। এমন দিন আসিতেছে যেদিন চিরদিনের তরে লম্বা পা ছড়াইয়া শয়ন করিবে; তখন কেউ তোমাকে ডাকিয়া জাগাইতে পারিবে না।

তুমি কড়ির ভিখারী হইয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছ, আর রাজার একমাত্র দুলাল সিদ্ধার্থ মৃত্যুচিন্তায় অস্থির হইয়া রাজসুখসম্ভোগ পরিত্যাগ করিয়া মুক্তিলাভের জন্য পথের ভিখারী সাজিলেন। এই মৃত্যুচিন্তাই শঙ্করকে সন্ন্যাসী করিল। শ্রীচৈতন্যকে পাগল করিয়া ঘরছাড়া করিল, বঙ্গের হর্ত্তাকর্ত্তা হোসেন শাহের মন্ত্রী রূপসনাতনকে কঁরোয়া কাঁথা সম্বল করাইয়া দীনের দীন করিল, আর কোটীপতি হিরণ্যদাসের পুত্র রঘুনাথকে পথে পথে কাঁদাইয়া ফকির সাজাইল! কিন্তু, তুমি তো নিশ্চিন্ত মনে ইন্দ্রিয়ের সম্ভোগে রত আছ, ভোগের অনলে

ইন্ধন জোগাইবার জন্য অহরহঃ যত অবাচ্য অকার্য্য আছে সবই অবাধে করিয়া যাইতেছ।

এমনি করিয়া আর কতকাল আত্মপ্রতারণা করিবে? মৃত্যু তো কাহাকেও রেহাই দিবে না! অবোধ, একবার দেহের পরিণাম ভাবো, মৃত্যু তোমার শিয়রে দেখ, কোন্ সময়ে তোমার শেষ নিঃশ্বাস বহির্গত হইবে—তাহার জন্য প্রস্তুত থাক!

দেহের পরিণাম ভাব, মৃত্যুচিন্তা কর, অহরহঃ আপনার দেহের চরম পরিণাম—একমুষ্টি ভষ্ম মানস নয়নে অবলোকন কর—তাহা হইলে আর রিপুর আধিপত্য থাকিবে না—কাম-ক্রোধ-লোভাদি তোমাকে প্রলোভনে মজাইয়া ধ্বংসের পথে নিবে না, ইন্দ্রিয়সম্ভোগে রত হইবার প্রবৃত্তি থাকিবে না। মন স্থির, গভীর শান্ত ও পবিত্র হইয়া উঠিবে। মৃত্যুচিন্তা তোমাকে নির্ম্মল করিবে, অকপট করিবে, সংযমী ও জিতেন্দ্রিয় করিবে—কর্ত্তব্য কর্ম্মে উৎসাহিত করিবে; ভগবচ্চরণে শরণ গ্রহণে বাধ্য করাইবে।

আত্মচিন্তা ঃ—

আজ আমার বয়স ১৫ বৎসর, এর পূর্ব্বে আমি কোথায় ছিলাম? কিরূপে এখানে আসিলাম? আমার কর্ত্তব্য কি? আমার জীবনের উদ্দেশ্য কি? মানবজীবনের উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত? সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমি চেষ্টা করিতেছি কি?

মানব! বিচার কর,—পশুত্ব ও দেবত্ব এই দু'য়ের অবস্থিতি মানুষের মধ্যে। তোমার অন্তরের দিকে তাকাও—দেখ, একদিকে পাশবিক প্রবৃত্তিনিচয়—কাম-ক্রোধ, লোভ-মোহ, ঈর্ষ্যা-ঘৃণা, বিদ্বেষ-পরশ্রী-কাতরতা ইত্যাদি তোমাকে অবিরত নরকের পথে আকর্ষণ করিতেছে। অপরদিকে ত্যাগ, সংযম, সেবা, অহিংসা, মৈত্রী, করুণা, নিঃস্বার্থতা ইত্যাদি যুক্ত হইয়া স্বর্গের পথে, পুণ্যের পথে যাইবার জন্য আহ্বান করিতেছে। মানুষের প্রবৃত্তি পাপের পথে অভ্যস্ত, আর সংসারে পাপের প্রলোভন বেশী, নরকের সহযাত্রী অনেক,—তাই মানব ঐ পাশবিক প্রবৃত্তির মোহে পড়িয়া অধঃপাতে যাইতে চায়, রিপুর কুহকে মজিয়া ইন্দ্রিয়ের সুখসম্ভোগে আকৃষ্ট হয়।

মানব জীবনের উদ্দেশ্য—আপন অন্তরের উক্ত পাশবিক বৃত্তি-নিচয়কে সংযত, বিধ্বস্ত করিয়া হৃদয়নিহিত দেবত্বকে বিকশিত করিয়া তোলা। ইহাই

মনুষ্যত্ব। এই মনুষ্যত্ব লাভের উপায়—সংযমসাধনা, ব্রহ্মচর্য্যসাধনা।

মানবজীবন লাভ করিয়া যে এই সাধনা না করিল, পশুত্বকে সংযত করিয়া দেবত্বের বিকাশে প্রযত্ন না করিল—তাহাকে মানুষ বলিবে কে? শুধু শৃগাল-কুকুরের মত খাইয়া, ঘুমাইয়া, বংশবৃদ্ধি করিয়া,—মারামারি, কাটাকাটি, ঝগড়াঝাটি করিয়া জীবন কাটাইতে কি মানুষ হইয়া জন্মিয়াছ?

আত্মবিচার কর, চিন্তা কর—আপনার হৃদয় তন্নতন্ন করিয়া অনুসন্ধান কর, যেখানে ত্রুটি, যেখানে নীচতা, যেখানে দুর্ব্বলতা, যেখানে ইন্দ্রিয়-সুখ-সম্ভোগের ইচ্ছা—নির্ম্মমভাবে সেখানে বিচারের কশাঘাত কর, তীব্র সঙ্কল্প বলে সেই পশুত্বের বিনাশ সাধনে উদ্যত হও। প্রতিজ্ঞা কর—শরীর ধ্বংস হয় হউক, তবু এ শরীর-মনে পশুত্বের প্রশ্রয় কিছুতেই দিব না।

আত্মপরীক্ষা

একখানির উপর আর একখানি ইষ্টক,—এমনি করিয়া একটি বিরাট অট্টালিকা গড়িয়া উঠে। মানবজীবন গঠন করিতেও তেমনি একটি একটি করিয়া যতত্রুটি ও গলদ নিঃশেষে দূর করিতে হইবে, আবার এক এক করিয়া অন্তরে সদ্‌বৃত্তিগুলিকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, সাধনায় ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য, সহিষ্ণুতা চাই, অন্যথা কোন দিকেই সাফল্য লাভ হয় না।

আত্মোন্নতিকামীকে প্রত্যহ শয়নের পূর্ব্বে আত্মপরীক্ষা করিতে হইবে। দিনের মধ্যে কি কি করা হইল, পূর্ব্বের দিন অপেক্ষা অদ্য ভালভাবে চলিলাম কি না, হৃদয়ের প্রবৃত্তির সংযম ও সদ্‌বৃত্তির বিকাশ কিরূপ ঘটিতেছে—পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া তাহার পরিচয় দৈনিক ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিতে হইবে। হিসাব না রাখিলে কোন বিষয়েই উন্নতি হয় না। আত্মোন্নতির কড়া হিসাব রাখা দরকার। ডায়েরী লেখার নমুনা পরপৃষ্ঠায় দেখান হইল ঃ—

মাস, বার ও তারিখ	প্রত্যুষে উঠিয়াছ কিনা? কয়টার সময় উঠিয়াছ?	কয়বার উপাসনা করিয়াছ?	কতক্ষণ প্রার্থনা করিয়াছ?	কত সংখ্যা জপ করিয়াছ?	ইচ্ছাপূর্ব্বক বীর্য্য ক্ষয় করিয়াছ কিনা?	অজ্ঞাতভাবে বীর্য্য ক্ষয় হইয়াছে কিনা?	কুচিন্তা করিয়াছ কিনা?	কুকথা শুনিয়াছ কিনা?	কুবাক্য বলিয়াছ কিনা?
সোম									
মঙ্গল									
বুধ									
বৃহ									
শুক্র									
শনি									
রবি									

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ উপরোক্ত ডায়েরীর তালিকার মত খাতা করিয়া তাহাতে উক্তরূপ ঘর কাটিয়া তন্মধ্যে দৈনিক যাহা যাহা করিয়াছ বা না করিয়াছ তদনুযায়ী 'হাঁ' বা 'না' লিখিয়া রাখিবে।

মাস, বার ও তারিখ	কুদৃশ্য দেখিয়াছ কিনা?	কুগ্রন্থ পড়িয়াছ কিনা?	অপ্রয়োজনে কথা বলিয়াছ কিনা?	কুলোকের সহিত মিশিয়াছ কিনা?	আহারের সংযম ছিল কিনা?	নিদ্রায় সংযম ছিল কিনা?	নিয়মিত ব্যায়াম করিয়াছ কিনা?	কৌপীন পরিয়াছ কিনা?	নিয়মিতভাবে মল মূত্রাদি পরিত্যাগ করিয়াছ কিনা?
সোম									
মঙ্গল									
বুধ									
বৃহ									
শুক্র									
শনি									
রবি									

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ উপরোক্ত ডায়েরীর তালিকার মত খাতা করিয়া তাহাতে উক্তরূপ ঘর কাটিয়া তন্মধ্যে দৈনিক উপরোক্ত রূপে যাহা যাহা করিয়াছ বা না করিয়াছ তদনুযায়ী ‘হাঁ’ বা ‘না’ লিখিয়া রাখিবে।

ওঁ

জগদ্‌গুরু

আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজী

সনাতন বৈদিক আদর্শ ও হিন্দুধর্ম্ম-সংস্কৃতির পরিপূর্ণ জ্বলন্ত বিগ্রহরূপে আবির্ভূত—যুগাচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ। ধর্ম্মহীন, ভগবদ্বিমুখ, ভোগসর্ব্বস্ব, জড় বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির প্রবল প্লাবনে নিমজ্জমান মানব-সমাজের পরিত্রাণের জন্য অধ্যাত্ম আদর্শপরায়ণ, ধর্ম্মসাধননিষ্ঠ, ভগবদেকশরণ, দিগ্বিজয়ী অখণ্ড হিন্দুজাতিগঠনই—তাঁহার উদ্দেশ্য।

আচার্য্যের জন্ম

পূর্ব্ববঙ্গের এক অখ্যাত পল্লীতে আচার্য্যের জন্ম ও আশৈশব সুকঠোর তপশ্চর্য্যা। সবল অত্যাচারীর কবল হইতে দুর্ব্বলের অব্যাহতি কামনা করিয়া এই সময়ে তদীয় পিতা গৃহস্থিত জাগ্রত দেবতা নীলরুদ্র মহাদেবের আরাধনায় সম্বৎসরকাল একাগ্রভাবে যাপন করেন। তদীয় ভক্তি ও ব্যাকুলতায় সুপ্রসন্ন দেবাদিদেব মহাদেব তদীয় পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার প্রার্থনা পুরণের আশ্বাস দান করেন। এই অলৌকিক ঘটনার পর ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে পুণ্যা মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে গোধূলি লগ্নে ভগবদবতার আচার্য্যের জন্ম।

দেবশিশুর অলৌকিক প্রকৃতি

অলৌকিক দেবশিশুর শ্যামসুন্দর নয়ন-মনোমোহন সুঠাম মূর্ত্তি সকলকেই আকর্ষণ করিত, শিশুর স্বভাব ছিল—অধিকতর আকর্ষণের বিষয়। জন্মাবধি শিশু স্থির, শান্ত, স্বস্থ। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর অতিলৌকিক প্রকৃতি পরিস্ফুট হইতে লাগিল। খেলাধূলায় আগ্রহ নাই, আহারাদির জন্য ব্যাকুলতা নাই, কাহারো কোলে যাইবার ইচ্ছা নাই, সর্ব্বদা আপন মনে, অচঞ্চলভাবে অবস্থিত। শিশুর নাম হইল বিনোদ। বস্তুতঃ শিশুর আকৃতি-প্রকৃতি, ভাবভঙ্গী, অঙ্গ-প্রচেষ্টার অনন্যতা ও মাধুর্য্য সকলেরই চিত্তবিনোদনকারী ছিল।

সংযমের প্রতিমূর্ত্তি দেব-বালক

শিশু বালকে পরিণত হইল; তাহার মধ্যে আন্‌মনা, উন্মনা, নিরাসক্ত ভাব ফুটিয়া উঠিল। অনেক সময় যাবৎ বালককে না দেখিয়া পিতা-মাতা যখন সন্ধান করিতেন, তখন দেখা যাইত সে কোন বৃক্ষতলে বালক সিদ্ধার্থের (তথাগত বুদ্ধদেব) ন্যায় ধ্যানস্থ, বাহ্যজ্ঞান-শূন্য অবস্থায় অবস্থিত। বালক অনাবশ্যক

একটি কথাও বলে না, অনাবশ্যক কোনো বিষয়ে আগ্রহ নাই, অনাবশ্যক কোনো দিকে চাহিত না, অনাবশ্যক একটি পদক্ষেপও করিত না। পরিপূর্ণ সংযম যেন বালকমূর্ত্তি ধরিয়া আবির্ভূত।

বৈরাগ্যমূর্ত্তি বিনোদ

কৈশোরে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে বিনোদের মধ্যে বিবেক-বিচার বৈরাগ্য ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। বিনোদ রীতিমত বিদ্যালয়ে যায়, কিন্তু; পড়াশুনায় আগ্রহ আদৌ নাই। শিক্ষক যখন পাঠ দিতেছেন, বালক তখন আন্‌মনা অর্ধবাহ্য অবস্থায় আপনার ভাবে ডুবিয়া রহিয়াছে। বিদ্যালয়ের ছুটি হইয়া গিয়াছে; শিক্ষক-ছাত্র সকলেই চলিয়া গিয়াছে, বিনোদ কিন্তু তখনও চিন্তামগ্ন, বাহ্য জ্ঞানহারা; বাহ্য জ্ঞান আসিলে ধীরে ধীরে গৃহে চলিয়া আসিত। শিক্ষক-ছাত্র সকলেরই প্রিয় ছিল সে, কেহই কোনো দিন তার ভাবের ব্যাঘাত জন্মাইবার ইচ্ছা করে নাই। স্বীয় গৃহের বহিঃপ্রাঙ্গণে নিজস্ব কুটিরে বালক সর্ব্বদা অবস্থান করিত। অনেক দিন দেখা যাইত বিনোদ পুস্তক খুলিয়া পড়িতে বসিয়াছে, আলো জ্বলিতেছে, সে কিন্তু ধ্যানমগ্ন। রাত্রি প্রভাত হইল, তবুও ধ্যান ভাঙ্গিল না, বাহির হইতে কেহ ডাকাডাকি করায় বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। শ্মশান হইতে মৃত ভ্রাতুষ্পুত্রের মস্তকের কঙ্কালটি নিয়া সংসারের অনিত্যতা, দেহ-গেহ-জীবন-যৌবনের পরিণাম চিন্তায় দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি কাটিয়া যাইত। একমাত্র জগদ্‌গুরু আচার্য্য শঙ্করের জীবনেই এত অল্প বয়সে এরূপ অলৌকিক বিবেক-বিচার-বৈরাগ্যের তীব্রতা লক্ষিত হইত।

এই সংযম, বৈরাগ্য, ধ্যান ও বাহ্য-জ্ঞনশূন্যতার আবরণ ভেদ করিয়া এই অদ্ভুত দিব্যজীবনের অলৌকিক ভাব, দর্শন ও অনুভূতি কেহই জানিতে পারিত না। কী তার ভাব, কী সে চায়, কী সে করে,—ইহার বিন্দু-বিসর্গও কেহই বুঝিত না।

বিনোদের বাহ্য মনোযোগের বিষয়

বিনোদ জনসঙ্গবিরক্ত, একান্তবাসী, বাহ্যজ্ঞানশূন্য, ধ্যানস্থভাবে প্রায়শঃ অবস্থান করিলেও দুইটি বিষয়ে সে সর্ব্বদা বিশেষ জাগ্রত ছিল ঃ

(১) পারিপার্শ্বিক বালক ও যুবকগণের স্বাস্থ্য ও নৈতিক চরিত্র গঠনের উপদেশ, উৎসাহ ও সহায়তা দান, (২) দুঃস্থ, বিপন্ন ও নিঃসহায়গণের আবশ্যক সর্ব্বপ্রকার সহায়তা দান। তাঁহার কোমল হৃদয় সতত জীবদুঃখকাতর ছিল, পতিত, দলিত, নিরাশ্রয়, নিরুপায়গণের প্রতি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের মতই তাঁহার অপরিসীম প্রেম ও করুণা প্রসারিত ছিল, সমাজের কোটি কোটি অজ্ঞ, অজ্ঞাত, অবজ্ঞাত, পতিত, দলিতের প্রতি তদীয় এই অনন্ত প্রেম ও করুণাই

ছিল পরবর্ত্তী জীবনে তাঁর জীবোদ্ধার, সমাজসংস্কার ও জাতিগঠনমূলক কর্ম্মধারায় মূল উৎস। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া এই সময়ে যে সকল পবিত্রচিত্ত বালক ও যুবকদের একটি দল গঠিত হইয়াছিল, তাহাদের অনেকেই পরবর্ত্তী জীবনে ত্যাগীর জীবন বরণ পূর্ব্বক তদীয় জাতিগঠন কার্য্যে আত্মদান করিয়াছিল। এই সকল তরুণগণের সম্মুখে তিনি বুদ্ধের অপূর্ব্ব ত্যাগ, সঙ্করের অলৌকিক বৈরাগ্য এবং শ্রীচৈতন্যের অদ্ভুত প্রেমের আদর্শ স্থাপনপূর্ব্বক জীবন গঠনের উপদেশ ও উৎসাহ দিতেন।

ব্রহ্মচর্য্যসাধনা ও তপশ্চর্য্যা

বাল্যাবধি তাঁহার আহার ছিল—শুধু নুন ও ভাত, তৎসহ কদাচিৎ কয়েকটি সিদ্ধ আলু; এই সামান্য আহার করিয়াও তিনি বৃহৎ দুই জোড়া মুদ্গর লইয়া রীতিমত ব্যায়াম করিতেন। তিনি বলিতেন—আলস্য, নিদ্রা, তন্দ্রাই মহাশত্রু। ব্যায়াম তাঁহার সাধনার অঙ্গ ছিল; ব্যায়ামের দ্বারা তিনি উক্ত শত্রুগণের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতেন। শরীরে জড়তা বোধ হইলেই তিনি মুদ্গর লইয়া ব্যায়াম করিতেন। তিনি অসাধারণ শারীরিক শক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁর ক্ষুদ্র কুটিরের মধ্যে দেখা যাইত—শয়ন ও উপবেশনের জন্য একখানি তক্তা, পড়িবার কয়েকখানি পুস্তক; দেবতাদের ছবি কয়েকখানি এবং উক্ত বিশাল একজোড়া মুদ্গার। পরিধেয়ের মধ্যে ছিল সর্ব্ব ঋতুতে একখানি শুভ্র বহির্ব্বাস ও একখণ্ড শ্বেত উত্তরীয়। রাত্রিতে নিদ্রা এক ঘন্টা মাত্র; তাহাও ক্রমে পরিত্যাগ করিয়া সুদীর্ঘ ছয়টি বৎসর একাদিক্রমে সম্পূর্ণ বিনিদ্র তপস্যার জীবন যাপন করেন। প্রথম প্রথম স্বীয় সাধনকুটিরেই রাত্রি অতিবাহিত করিতেন; পরে সমস্ত দিন সাধন কুটিরে এবং সমস্ত রাত্রি শ্মশানক্ষেত্রে কঠোর তপশ্চর্য্যায় নিমগ্ন রহিতেন। একবার সাধনকালে বহুক্ষণ সমাধিস্থ থাকার পর নাসিকাপথে প্রচুর রক্তস্রাব হয়। পিতা-মাতা ভীত হইয়া চিকিৎসা করাইতে ইচ্ছা করিলে তিনি বুঝাইয়া দেন যে উহা ব্যাধিজনিত নয়, তীব্র যোগসাধনার প্রতিক্রিয়া মাত্র। প্রথম প্রথম শীতকালে তিনি এক খণ্ড কম্বল ব্যবহার করিতেন, একদিন শরীরে একটু জড়তা বোধ করায় উহাও পরিত্যাগ করেন।

তদীয় পিতা-মাতার পরামর্শক্রমে কুলপুরোহিত মহাশয় বিনোদকে কিছু কিছু দুগ্ধ বা ঘৃত গ্রহণপূর্ব্বক পিতা-মাতার মনোদুঃখ দূর করিতে অনুরোধ করিয়া বলেন—ঘৃত-দুগ্ধাদি তো সাত্ত্বিক খাদ্য। প্রত্যুত্তরে বিনোদ তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন—"বিধাতা আমাকে যে টুকু শক্তি দিয়েছেন, যদি তা' রক্ষা করি, নষ্ট হ'তে না দিই, তবে নুন্ ভাত খেয়েই আমার শক্তির অভাব হবে না। অল্প পরিমাণ দুধও জ্বাল দিতে থাকলে উথ্‌লে কড়া ছাপিয়ে পড়ে যায়। তেমনি

ভাল ভাল গুরুপাক, উপাদেয় খাদ্য খেয়ে শরীরে পুষ্টি আনতে গেলে উত্তেজনা এসে শক্তি নষ্ট হয়ে যায়।

দীক্ষা-সাধনা-সিদ্ধি

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ১৭ বৎসর বয়সে তিনি গোরক্ষপুর মঠের যোগিরাজ বাবা গম্ভীরনাথজীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দের পৌষী পূর্ণিমা তিথিতে তাঁহার মধ্যে ভগবৎ শক্তির বিকাশ আরম্ভ হয় এবং তৎপরবর্ত্তী মাঘী পূর্ণিমা দিবসে এক কদম্ব বৃক্ষতলে নির্ব্বিকল্প সমাধিস্থ অবস্থায় তাঁহার মধ্যে সর্ব্বনিয়ন্ত্রী শক্তির বিকাশের পরিপূর্ণতা ঘটে এবং পরবর্ত্তী জীবনের জগৎ-কল্যাণকর "কর্ম্মচক্র" সম্বন্ধে সাক্ষাৎ নির্দ্দেশ প্রাপ্ত হন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ২০ বৎসর। তাঁহার সেই সিদ্ধপীঠেই পরবর্তীকালে "শ্রীশ্রীপ্রণবমঠ" এবং বিখ্যাত "ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের" ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

এ বিষয়ে তদীয় স্বলিখিত উপদেশপত্রে পাই—"সর্ব্বনিয়ন্তার আদেশে মাঘী পূর্ণিমায় বাজিতপুর সিদ্ধপীঠে তোমাদের সঙ্ঘের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। সর্ব্বনিয়ন্তা স্বয়ং তোমাদের সঙ্ঘের পরিচালনা ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন।" "মাঘী পূর্ণিমার দিনে তপঃশক্তি ও তপস্তেজের পূর্ণ বিকাশের সময়ে যাহাতে সঙ্ঘনেতার তপঃপ্রভাব ও শুভদৃষ্টি গ্রহণ করিতে পার, প্রাণের এমন আকুলতা ব্যাকুলতা নিয়া উপস্থিত হইতে চেষ্টা করিবে।" সিদ্ধিলাভের পর প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমায় সিদ্ধপীঠে ভগবদবতার আচার্য্যের অলৌকিক মহাতপঃশক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটিয়া থাকে।

সন্ন্যাসিসঙ্ঘ সংগঠন ও কর্ম্ম চক্র প্রবর্ত্তন

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে হইতে তিনি অনুগত তরুণগণের সহায়তায় জনহিতকর কার্য্যবিস্তার আরম্ভ করেন। তৎপরে ক্রমাগত বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের সর্ব্বত্র দুর্ভিক্ষ, প্লাবন, মহামারী প্রভৃতি যাবতীয় দৈবদুর্ব্বিপত্তিতে ক্রমশঃ বিরাট ভাবে জন-সেবাকার্য্য পরিচালিত হইতে থাকে। কর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অতি দ্রুত তদীয় ভগবন্নির্দ্দিষ্ট উত্তরসাধক ত্যাগী সন্তানবৃন্দ তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করিতে থাকে। তিনি এই সর্ব্বত্যাগী সন্তানগণকে নিয়া জগদ্ধিতকল্পে আত্মোৎসর্গকারী সন্ন্যাসিসঙ্ঘ রচনা এবং নানাস্থানে আশ্রম স্থাপন করিতে থাকেন এবং স্বীয় সঙ্ঘের প্রাণস্বরূপ উক্ত ত্যাগী সন্তানগণের জীবন স্বীয় দিব্য-জীবনের আদর্শে গঠন করিতে প্রবৃত্ত হন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক "আচার্য্য" রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া "ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ" গঠন করেন।

সঙ্ঘসন্তানগণের শিক্ষা-সাধনা

তিনি সন্তানগণকে "বুদ্ধের ত্যাগ, শঙ্করের বিবেকবৈরাগ্য, শ্রীচৈতন্যের প্রেমের" বিষয় চিন্তা করিতে উপদেশ দিতেন। "তোমাদিগকে ত্যাগের জ্বলন্ত প্রতিমূর্ত্তি হইতে হইবে। তোমরা সনাতন আদর্শে গঠিত হইয়া আর্য্য ঋষিদের আসনে উপবেশন পূর্ব্বক এই অধঃপতিত দেশকে নীতি ও ধর্ম্মের পথে পরিচালন করিবে। শত সহস্র সন্তপ্ত প্রাণকে সুশীতল করিবার জন্য তোমাদের সঙ্ঘকে উপযুক্ত করিয়া তোল; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিগুলিকে সমবেত ও সম্মিলিত করিয়া বিরাট সঙ্ঘশক্তিকে সংগঠন কর। এইরূপে পরিত্রাণ কর পতিতকে, রক্ষা কর বিপন্নকে, আশ্রয় দাও নিরাশ্রয়কে, শান্তিসুখ দাও সন্তপ্তকে।"

তিনি সন্তানগণকে ব্রহ্মচর্য্য সাধনায় প্রাণপণ চেষ্টা করিতে নির্দ্দেশ দিয়া বলিতেন—"রিপুদমন ও ইন্দ্রিয়সংযমই ধর্ম্মের মুলমন্ত্র, ব্রহ্মচর্য্যই সর্ব্বোচ্চ সাধনা। ন তপস্তপ ইত্যাহুর্ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমম্। বীর্য্যই জীবন, বীর্য্যই প্রাণ, বীর্য্যই অমৃত, বীর্য্যই অক্ষয় শক্তির অনন্ত উৎস; বীর্য্যই মানুষের মনুষ্যত্ব, বীর্য্য ধারণে মানুষ দেবত্ব লাভ করে। বীর্য্যক্ষয় করিয়া মানুষ পশুত্ব প্রাপ্ত হয়।" ব্রহ্মচর্য্য সাধনার সোপান স্বরূপ তিনি আহারসংযম, বাক্‌সংযম, সঙ্কল্পসাধনা এবং মৃত্যুচিন্তা (বৈরাগ্য-বিচার) শিক্ষা দিতেন। তিনি বলিতেন, যে ব্যক্তি যত্নপূর্ব্বক বীর্য্য ধারণ করে, শুধু ভাত বা ডালভাতেই তার শরীর সবল ও কর্ম্মঠ থাকে; আহার ও নিদ্রা বিশেষভাবে পরিমিত হওয়া চাই। অতিরিক্ত আহার ও নিদ্রায় বীর্য্যক্ষয় ও তমোগুণের বৃদ্ধি হয়; ফলে উদ্যম, উৎসাহ, আনন্দ ও কর্ম্মশক্তি বিলুপ্ত হয়। বাক্ সংযমে মনের স্থৈর্য্য ও গাম্ভীর্য বর্ধিত, স্মৃতিশক্তি অটুট, চিন্তাশক্তি তীব্র এবং চিত্ত প্রসন্ন ও প্রশান্ত হয়।

সঙ্কল্প রক্ষার সাধনাই যথার্থতঃ সত্যের সাধনা; সত্যের সাধনা দ্বারাই সত্য-স্বরূপ ভগবানকে লাভ করা যায়। "সঙ্কল্পে যে দৃঢ়, প্রতিজ্ঞায় যে অবিচলিত, যাবতীয় সিদ্ধি তার করতলগত"—ইহাই ছিল তাঁর বজ্রদৃঢ় নির্দ্দেশবাণী। সঙ্কল্পশক্তি যাহাতে ক্রমাগত বর্ধিত হয়, তজ্জন্য সন্তানগণকে তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক তাহা অটুটভাবে পালন করিবার নির্দ্দেশ দিতেন। দিনরাত্র ২৪ ঘন্টার জন্য নিয়ম ও কর্ম্মতালিকা প্রস্তুতপূর্ব্বক ঘড়ির কাঁটায় উহা পালন করিতে আদেশ দিতেন। মৃত্যুচিন্তা বা বৈরাগ্যবিচারের উপদেশ দিয়া বলিতেন—"মৃত্যুচিন্তার দ্বারাই জগতের অবাস্তবতা, দেহের অনিত্যতা, জীবন-যৌবনের ক্ষণভঙ্গুরতা, জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর ভীষণতা জ্বলন্তভাবে অনুভূতি হয়; তাহাতে মানুষের বিষয়াসক্তি, ইন্দ্রিয় ভোগাকাঙ্ক্ষা ও পাপপ্রবৃত্তির মূল নষ্ট হয়। মৃত্যুচিন্তাই বুদ্ধকে রাজৈশ্বর্য ত্যাগে বাধ্য করিয়াছিল; আচার্য্য শঙ্করকে বাল্যে

সন্ন্যাস গ্রহণে প্রেরণা দিয়াছিল; মৃত্যুচিন্তায়ই—বুদ্ধের বুদ্ধত্ব, শঙ্করের শঙ্করত্ব, চৈতন্যের চৈতন্যত্ব।”

ত্যাগী সন্তানগণের মনে স্বাভাবিক প্রশ্ন ছিল যে নির্জ্জন অরণ্যে বা পর্ব্বতগুহায় জনসঙ্গ ত্যাগ ও একান্ত বাসপূর্ব্বক সাধন-ভজন, তপ-জপ না করিলে ভগবৎ কৃপা লাভ সম্ভব কি? তাহাদের এই ধাঁধাঁ ঘুচাইয়া দিয়া তিনি বলিতেন—“গিরিগহ্বরে বসিয়া তপস্যা না করিলে ভগবৎ কৃপা লাভ হইবে না,—এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক ও মিথ্যা। সমাহিত মনই নির্জ্জন গিরিগুহা।

ধর্ম্মের রহস্য উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক আচার্য্য বলিতেন—“ধর্ম্মের প্রাণ অনুভূতি, অনুষ্ঠান ও আচরণে। শাস্ত্র পড়িয়া, লোকমুখে শাস্ত্রকথা শুনিয়া কেহ কদাপি ধর্ম্মলাভ করিতে পারে না।” “ধর্ম্ম নাই—মালায় ঝোলায়; ধর্ম্ম নাই—তিলক ফোঁটায়, ধর্ম্ম নাই—অশনে বসনে, ধর্ম্ম নাই—মন্দিরে মসজিদে; ধর্ম্ম আছে—ত্যাগে, সংযমে, সত্যে, ব্রহ্মচর্য্যে।”

গুরুবন্দনা

১

ভব-সাগর-তারণ-কারণ হে
রবি-নন্দন-বন্ধন-খণ্ডন হে।
শরণাগত কিঙ্কর ভীত মনে,
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে।।

২

হৃদি-কন্দর-তামস-ভাস্কর হে
তুমি বিষ্ণু প্রজাপতি শঙ্কর হে।
পরব্রহ্ম পরাৎপর বেদ ভনে,
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে।।

৩

মন-বারণ-শাসন-অঙ্কুশ হে
নর-ত্রাণ তরে হরি চাক্ষুষ হে।
গুণ-গান-পরায়ণ দেবগণে,
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে।।

৪

কুলকুণ্ডলিনী-ঘুম-ভঞ্জক হে
হৃদি-গ্রন্থি-বিদারণ-কারক হে।
মম মানস চঞ্চল রাত্রি দিনে,
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে।।

৫

রিপুসূদন-মঙ্গল-নায়ক হে
সুখ-শান্তি-বরাভয়-দায়ক হে।
ত্রয় তাপ হরে তব নামগুণে,
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে।।

৬

অভিমান-প্রভাব-বিমর্দ্দক হে
গতিহীন জনে তুমি রক্ষক হে।
চিত শঙ্কিত, বঞ্চিত ভক্তিধনে,
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে।।

৭

তব নাম সদা শুভ-সাধক হে
পতিতাধম-মানব-পাবক হে।
মহিমা তব গোচর শুদ্ধ মনে,
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে।।

৮

জয় সদ্‌গুরু ঈশ্বর-প্রাপক হে
ভবরোগ-বিকার-বিনাশক হে।
মন যেন রহে তব শ্রীচরণে,
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে।।

(ভৈরবী)

গুরু নারায়ণ আশিস বর্ষণ
কর তব দীন দুর্ব্বল সন্তানে।
মোদের তুমি বিনে কে আছে ভুবনে
নাশিতে অজ্ঞানে যোগ-জ্ঞান দানে।
পাপের কুমন্ত্রণা যেন নাহি জাগে
এই ভিক্ষা প্রভো মাগি হে শ্রীপদে,
থেকে মোদের হৃদে রেখো নিরাপদে
সম্পদে বিপদে জীবনে মরণে।
(হ'য়ে) নিত্যনির্বিকার নির্গুণ অক্ষয়
অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়
ক'রে দেহাশ্রয় জন্মমৃত্যুক্ষয়
করিতেছ নাথ তত্ত্বজ্ঞান দানে।
ভবারাধ্য ধন ও রাঙা চরণ,
মোহে মগ্ন হয়ে চিনি নাই কখন,
করি নিবেদন, যেন মোদের মন,
সদা সর্ব্বক্ষণ রহে ও-চরণে।।
তোমারি আদেশ সদা শিরে ধরি
সাধন-পথেতে বিচরণ করি,
দিতে যেন পারি, ভব-নদী পাড়ি,
ডুবি নাহি যেন এ-মোহ-জীবনে
(কত) জনম ব্যাপিয়ে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে
সকলে মিলেছি চরণে আসিয়ে,
তোমারে হেরিয়ে, জুড়াইব হিয়ে
পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজিব চরণে।

ওঁ প্রণমামি প্রণবানন্দম্

ওঁ প্রণমামি প্রণবানন্দম্।
ধৃত-নরবিগ্রহ-হৃত-নরনিগ্রহ-বিলসিত-ব্রহ্মানন্দম্।।
ললিত-সুশান্তং সুগম্ভীর-কান্তং সুবেশ-মনোহর-ভান্তম্।

হাস্য-সুরঞ্জিত-লাস্য-সুবঞ্চিত-বিশ্বপ্রেমাঞ্চিত-কান্তম্।।
সুজট-শিরোরুহ-সুপট-সমারোহ-সুন্দর-কন্ধর-যুক্তম্।
নয়ন-সুলোহিত-অয়ন-বিমোহিত-বদন-সমাহিত-চিত্তম্।।
আনন-সুধাকর-ক্ষরণ-সুধাধার-বচন-সুধাসার-ভারম্।
বক্ষোবিলম্বিত-সখ্য-সুলম্বিত-লক্ষ-প্রেমান্বিত হারম্।।
ভক্ত-মনোমদ-রক্ত-কোকনদ-শ্রীপদ-দ্বিপদ-সঙঘম্।।
সুর-নর-বাঞ্ছিত-পীযূষ-সিঞ্চিত-অনঙ্গ-গঞ্জিত-অঙ্গম্।।
ত্রিশূল-শোভিত-দণ্ড-বিমণ্ডিত-খণ্ডিত-ভণ্ড-প্রসঙ্গম্।
ভক্ত-সুবৎসল-রক্ত-জনোচ্ছ্বল-ব্যক্ত-প্রেমোজ্জ্বল-রঙ্গম্।।
ত্বমসি মে শরণং ত্বমসি মে জীবনং চরণ-সেবন-সুখসারম্
করুণয়া স্বীকুরু ত্বং হি জগদ্গুরুঃ তারয় ভব-ভয় পারম্।।

(ভৈরব)

এস হৃদি-মন্দিরে প্রণবানন্দ ত্রিশূল-দণ্ডধারি।
এস মানব-হৃদয়-রঞ্জন পাপ-ভঞ্জন ভয়হারি।।
এস হে ভারত-সূর্য! তোমার লাঞ্ছিত মৃত দেশে,
এস রুদ্র গৈরিক বেশে।
এস সন্তান তরে সুকরুণ করে সুধামাখা হাসি হেসে ;
এস হাতে নিয়ে তব জীবন-আশিস্
প্রেমের অমিয়বারি।।
ওগো, তোমারে পূজিতে আজি—
মঞ্জুল-ফুলমালাটি গাঁথিয়া
আসিয়াছি দীন সাজি ;
তব বিরহবেদনা সহে না সহে না
উঠিছে হৃদয়ে বাজি।
মম চিত্তমুকুরে ফুটে ধীরে ধীরে
তোমারি আননখানি ;
মম শ্রবণেরি মাঝে ঝঙ্কারি উঠে
তব মুখ-মধুবাণী।
এসে লহ গো দীনের জীবন-অর্ঘ্য
প্রাণ-ধন-দানকারি।।

পরব্রহ্ম-রূপ গুরু করুণা-নিধান।
তুমি চিরপূজ্য হে উজ্জ্বল মুক্ত মহান্।
দুর্গম পথ অতি ঘন তমসায়
চলিবে সংসার মাঝে কোন্ ভরসায়?
আমায় নিয়ে চল সাথে সাথে তব পরিচিত পথে
কলুষ-বিনাশী প্রভো দাও হে কল্যাণ।।
কুটিল কু-আশা ঘেরা পথ-সীমানা
আঁধারে চলিব কোথা নাহি ঠিকানা,
আমার কেমনে ঘুচিবে আঁধি তুমি না দেখাবে যদি
চির উদার উন্নত চরণ-নিশান।।
ভব-সংসার মাঝে তুমি আলোক-রেখা,
পথহারা পথিকেরে দিবে কি দেখা?
আমায় দাও পথ-পরিচয় হে চিরমঙ্গলময়
রাখ হে গৌরব তব ওহে গরীয়ান্।।

(বিভাস-বিলাবল)

আমরা কেন ভোগে ভুলিব? আমরা যে ভাই ত্যাগীর ছেলে।
এখন ভোগ-বিলাসে মত্ত হ'য়ে অনুমানি তা' গেছি ভুলে।।
ভুলেই তো এ দুর্গতি ঘটছে মোদের পদে পদে,
নইলে কোটি কোটি মাথা লুটতো এসে মোদের পদে,
দেখে কাঁপিত বিশ্ববাসী, বিশ্ব পদে লুটতো আসি,
দৃশ্য দেখে বিশ্বপতি কৃপাবারি দিতেন ঢেলে।।
মনে নাই সে মোদের পূর্ব্বপুরুষগণের স্মৃতি,
কেহ দণ্ডী ব্রহ্মচারী কেউ সন্ন্যাসী কেউ বা যতী,
যোগাসনে বসে তারা কাটাতো কাল কুতূহলে।
মনে করলে হ'তে পারত ও ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি,
তা না হ'য়ে নিবিড় বনে নীরবে রইতো দিবারাতি।
কত রাজরাজেশ্বর আসি তাঁদের পদতলে বসি,
কৃপাবিন্দু লাভের তরে পা ধোয়াত আঁখির জলে।।
এখন দেখছি কালের স্রোতে বইছে তার বিপরীত ধারা,
ত্যাগীর ছেলে ভোগীর পায়ে ঢালছে কত অশ্রুধারা;

পাপ উদর আর স্বার্থের লাগি আত্মগৌরব হারালে।।
এখনো সময় আছে বসে যা রে গভীর ধ্যানে,
কেঁদে কেঁদে ডেকে ডেকে বাধ্য কর্ তোর ভগবানে,
পুনঃ যদি তা পারিস্ হ'তে তবেই দেখ্‌বি এ ভারতে
বইবে আবার উল্‌টো স্রোত ভাসবি সুখের হিল্লোলে।।
যাওনা পুনঃ গুরুগৃহে ধর না ব্রহ্মচারীর বেশ।
কর উচ্চ বেদধ্বনি সামগানে মাতাও না দেশ।
হও না পুনঃ সর্ব্বত্যাগী রও না জগৎ-মঙ্গলে।।
পুনঃ যদি তপস্যাতে একটি ব্রাহ্মণ হ'তে পার;
কার্যক্ষেত্রে মায়ের নামে এ জগৎ মাতাতে পার;
তবেই যাবে এ দুর্গতি নইলে রে ভাই অধোগতি।
এতেই ডুবে যাবে রে ভাই মোহ-সিন্ধুর অতলজলে।।

(ইমন কল্যাণ)

কোথায় ধর্ম্ম, কোথায় সত্য, কোথায় পুণ্য, কোথায় দান।
লুপ্ত দেব-মহিমা যে আজি সুপ্ত ভারতে আর্য্য-প্রাণ।।
একদা যাহার ক্ষত্রিয় রাজা ধর্ম্মের তরে পালিল দেশ।
প্রাণের মমতা তুচ্ছ করিল, হরিতে আর্ত্ত জনের ক্লেশ!
স্বর্গ হইতে সম্পদ নিল বিরাট ধনুকে জুড়িয়া বাণ।
তাদের বংশে জন্ম যদি গো কোথায় হারালে সে সম্মান?
কোথায় দধীচি কে দিবে অস্থি কোথায় শিবি যে কাটিবে বুক?
কর্ণ কোথায় সত্য তরে কাটিবে পুত্রের হাস্যমুখ?
হরিশ্চন্দ্র কোথা আজ হবে চণ্ডাল করি পৃথিবী দান?
শৈব্যা কোথায় বিক্রীতা হয়ে করিবে রক্ষা স্বামীর মান?

সুর—ঝিঁ ঝিঁ ট

প্রণমামি পরমব্রহ্ম ভকত-ভয়-ভঞ্জন।
করুণার্ণব দেব-দেব সেবক-হৃদি-রঞ্জন।।
আর্য্যকুলে করি জনম গ্রহণ, আর্য রীতিনীতি নাহিক স্মরণ,
অনার্য্য-আচারে কলুষিত মন, কুরু কৃপা দীন-তারণ।।
শান্তি-সরলতা-জ্ঞান-ধর্ম্ম নীতি, প্রচারি ভারতে হর হে দুর্গতি,

নরনারী বৃদ্ধ বালকে সুমতি, দাও হে ভুবন-পাবন।।
তব নাম গানে মাতুক ভারত, তবোদ্দেশে হোক দেশহিতে রত,
পরিব্রাজক ঐ চরণে প্রণত, জয় জয় হরি জনার্দ্দন।।

মন চল নিজ নিকেতনে!
সংসার-বিদেশে বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে?
সত্য পথে মন কর আরোহণ,
প্রেমের আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ,
সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্যধন
গোপনে অতি যতনে।
সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থধাম
শ্রান্ত হলে সেথা করিও বিশ্রাম;
পথভ্রান্ত হলে শুধাইও পথ
সে পান্থ-নিবাসী জনে।
লোভ-মোহ আদি পথে দস্যুগণ
পথিকের করে সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন;
পরম যতনে রেখ রে প্রহরী
শম দম দুইজনে।
যদি দেখ পথে ভয়েরই আকার
প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার;
সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ,
শমন ডরে যাঁর শাসনে।

গুরুপ্রণাম-মন্ত্র

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।
মন্ত্র সত্যং পূজা সত্যং সত্যং দেবো নিরঞ্জনঃ।
গুরোর্বাক্যং সদা সত্যং সত্যমেব পরং পদম্।।
অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

পিতৃ-মাতৃ-সুহৃদ্-বন্ধু-বিদ্যাতীর্থানি দেবতা।
ন তুল্যং গুরুণা শীঘ্রং স্পর্শয়েৎ পরমং পদম্।।
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু র্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদম্।
মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা।।
ব্রহ্মানন্দং পরম সুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিম্।
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষীভূতম্।
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি।।
ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব।
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব।
ত্বমেব সর্ব্বং মম দেব দেব।।

শিবনামাবল্যষ্টকম্

হে চন্দ্রচূড় মদনান্তক শূলপাণে
স্থাণো গিরিশ গিরিজেশ মহেশ শম্ভো।
ভূতেশ ভীতভয়সূদন মামনাথং
সংসার-দুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ।।১
হে পার্ব্বতী-হৃদয়বল্লভ চন্দ্রমৌলে
ভূতাধিপ প্রমথনাথ গিরীশজাপ।
হে বামদেব ভব রুদ্র পিনাকপাণে
সংসার-দুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ।।২
হে নীলকণ্ঠ বৃষভধ্বজ পঞ্চবক্ত্র
লোকেশ শেষবলয় প্রমথেশ শর্ব্ব।
হে ধূর্জ্জটে, পশুপতে গিরিজাপতে মাং
সংসার-দুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ।।৩
হে বিশ্বনাথ শিব শঙ্কর দেবদেব
গঙ্গাধর প্রথমনায়ক নন্দিকেশ।
বাণেশ্বরান্ধকরিপো হর লোকনাথ

সংসার-দুঃখ-গহনাজ্জগদীশ রক্ষ।।৪
বারাণসীপুরপতে মণিকর্ণিকেশ,
বীরেশ দক্ষমখকাল বিভো গণেশ।
সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বহৃদয়ৈক-নিবাস নাথ
সংসার-দুঃখ-গহনাজ্জগদীশ রক্ষ।।৫
শ্রীমন্মহেশ্বর কৃপাময় হে দয়ালো
হে ব্যোমকেশ শিতিকণ্ঠ গণাধিনাথ।
ভস্মাঙ্গ-রাগ নৃকপাল-কলাপমাল
সংসার-দুঃখ-গহনাজ্জগদীশ রক্ষ।।৬
কৈলাসশৈল-বিনিবাস বৃষাকপে হে
মৃত্যুঞ্জয় ত্রিনয়ন ত্রিজগন্নিবাস।
নারায়ণপ্রিয় মদাপহ শক্তিনাথ
সংসার-দুঃখ-গহনাজ্জগদীশ রক্ষ।।৭
বিশ্বেশ বিশ্ব-ভবনাশ্রয় বিশ্বরূপ
বিশ্বাত্মক ত্রিভুবনৈক-গুণাধিবাস।
হে বিশ্ববন্দ্য করুমাময় দীনবন্ধো
সংসার-দুঃখ-গহনাজ্জগদীশ রক্ষ।।

গঙ্গাস্তোত্রম্

দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে, ত্রিভুবন-তারিণি তরল-তরঙ্গে।
শঙ্করমৌলিনিবাসিনি বিমলে মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে।।১
ভাগীরথি সুখদায়িনি মাতস্তব জলমহিমা নিগমে খ্যাতঃ।
নাহং জানে তব মহিমানং, ত্রাহি কৃপাময়ি মামজ্ঞানম্।।২
হরিপাদপদ্মবিহারিণি গঙ্গে, হিম-বিধু-মুক্তা-ধবল-তরঙ্গে।
দূরীকুরু মাম দুষ্কৃতিভারং, কুরু কৃপয়া ভবসাগরপারম্।।৩
তব জলমমলং যেন নিপীতং, পরমপদং খলু তেন গৃহীতম্।
মাতর্গঙ্গে ত্বয়ি যো ভক্তঃ, কিল তং দ্রষ্টুং ন যমঃ শক্তিঃ।।৪
পতিতোদ্ধারিণি জাহ্নবি গঙ্গে, খণ্ডিত-গিরিবর-মণ্ডিতভঙ্গে।
ভীষ্মজননি খলু মুনিবরকন্যে, নরকনিবারিণি ত্রিভুবনধন্যে।।৫
কল্পলতামিব ফলদাং লোকে, প্রণমতি যস্ত্বাং ন পততি শোকে।
পারাবার-বিহারিণি গঙ্গে, বিবুধবধূকৃত-তরলাপাঙ্গে।।৬
তব কৃপয়া চেৎ স্রোতঃস্নাতঃ, পুনরপি জঠরে সোঽপি ন জাতঃ।

নরকনিবারিণি জাহ্নবি গঙ্গে, কলুষবিনাশিনি মহিমোত্তুঙ্গে ।।৭
পরিলসদঙ্গে পুণ্য-তরঙ্গে, জয় জয় জাহ্নবি করুণাপাঙ্গে।
ইন্দ্র-মুকুটমণি-রাজিত-চরণে, সুখদে শুভদে সেবক-শরণে ।।৮
রোগং শোকং তাপং পাপং, হর মে ভগবতি কুমতিকলাপম্।
ত্রিভুবনসারে বসুধাহারে, ত্বমসি গতির্ম্মম খলু সংসারে ।।৯
অলকানন্দে পরমানন্দে, কুরু ময়ি করুণাং কাতরবন্দ্যে।
তব তটনিকটে যস্য হি বাসঃ, খলু বৈকুণ্ঠে তস্য নিবাসঃ ।।১০
বরমিহ নীরে কমঠো মীনঃ কিংবা তীরে সরটঃ ক্ষীণঃ।
অথবা গব্যুতৌ শ্বপচো দীনঃ, ন চ তব দূরে নৃপতিকুলীনঃ ।।১১
ভো ভুবনেশ্বরি পুণ্যে ধন্যে, দেবি দ্রবময়ি মুনিবরকন্যে।
গঙ্গাস্তবমিদমমলং নিত্যং পঠতি নরো যঃ স জয়তি সত্যম্ ।।১২
যেষাং হৃদয়ে গঙ্গাভক্তিঃ তেষাং ভবতি সদা সুখমুক্তিঃ।
মধুরমনোহরপজ্ঝটিকাভিঃ পরমানন্দকলিতললিতাভিঃ ।।১৩
গঙ্গাস্তোত্রমিদং ভবসারং বাঞ্ছিতফলদং বিদিতমুদারম্।
শঙ্করসেবক-শঙ্কররচিতং পঠতু চ বিষয়ীদমিতি সমাপ্তম্ ।।১৪

(সুর—দেশমিশ্র)

ভেঙোনা ঘর ভেঙোনা করি মিনতি,
বাংলা দেশের হিন্দু সন্ততি!
ভাইয়ের চেয়ে কে আছে আপন?
একই গর্ভে জন্ম নিলে,
একই মাকে মা বলিলে,
একই কোলে মানুষ হ'লে
পিয়ে মায়ের স্তন।
এই দেশেতে হাজার বছর
লাগেনি কো দুঃখের আঁচড়,
ভায়ে ভায়ে বেঁধেছিল
একই স্নেহের ডোর!
এখন কেন ভার হলো ভাই
ভায়ে ভায়ে বসতি।।
গৃহলক্ষ্মি! বলি তোদের আজ,
জীর্ণ ঘরটি ভেঙোনা কো
জীবন-সন্ধ্যা মাঝ।

এই দেশেতে সীতা ছিল,
এই দেশেতে সতী ছিল,
সত্যবানও বেঁচেছিল
সাবিত্রীর কথায়।
সেই মাটীই তো তোদের ঐ পায়।
ভেঙোনা সুখের মিলন,
ছিঁড়োনা স্নেহের বাঁধন,
পরের ছেলে আপন ভেবে
সব দুঃখ সয়ো,
সব দিক বজায় রেখো
সহেন যেমন বসমতী।।

(সিন্ধু)

এস চির-সুন্দর মুরতি মনোহর
সন্তান-অন্তর মাঝে,
ভকত-জীবন-ধন জনগণ-তারণ
ত্রিভুবন-বিমোহন সাজে।।
এস মম কাণ্ডারী গৈরিক ত্রিশূলধারী
ভয়হারী প্রণব-বিহারী।
দেবতা-বাঞ্ছিত দরশনে আকুলিত
ব্যাকুলিত কত নর-নারী।।
জন-মন-পূরিত সমাহিত শিহরিত
মন্দ্রিত তব গীতি-গানে।
ভকত-বৎসল কান্ত সমুজ্জ্বল
নিরমল শতদল প্রাণে।।
বিপদ-ভঞ্জন দেব-নিরঞ্জন
জনম-মরণজয়ী স্বামী।
এস, হৃদি-ভাস্বর পূর্ণ-শশধর
দুঃখহর অন্তরযামী।।
এস, হৃদি-মন্দিরে অন্তরে বাহিরে
তোমারি মহিমাগীতি বাজে,
জীবন-শতদলে সাজাব চরণতলে
এস গুরু নব নব সাজে।।